১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

জন্ম ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ মৃত্যু ঃ ১০ নভেম্বর ১৯৮৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ নভেম্বর '৮৩
স্মরণে

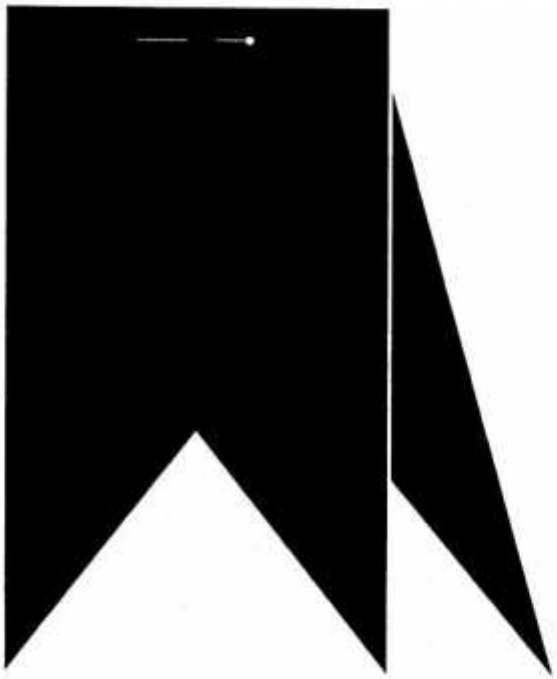

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ নভেম্বর' ৮৩ স্মরণে

Dashai November'83 Shmarane

প্রকাশকাল ঃ
১০ নভেম্বর ২০০১

Published on:
10 November 2001

প্রকাশনায় ঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Published by:
Department of Imformation & Publicity
Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কল্যাণপুর, রাঙামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
টেলিফোনঃ +৮৮০-৩৫১-৬৩২৮৪
ই-মেইলঃ pcjss@abnetbd.com

Postal Address:
Department of Information & Publicity
Central Office
Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti
Kalyanpur, Rangamati
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
Tel : +880-351-63284, Fax: +880-351-63284
E-mail: pcjss@ abnetbd.com

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৩০.০০ টাকা

Price: Tk. 30 .00

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৪
জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন, বিভেদপন্থী চক্রান্ত ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা	উদয়ন চাকমা	৫
বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনাদর্শ	বীর কুমার তংচঙ্গ্যা	১৫
সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ ঃ যুব সমাজ	তনয় দেওয়ান	১৭
নির্বাচন রঙ্গ	সুদীর্ঘ চাকমা	২০
ইউপিডিএফ এর নির্বাচন প্রসঙ্গে কিছু কথা	তাপস দেওয়ান	২২
পার্বত্য রাজনীতি ও জুম্ম জনগণ	তাতিন্দ্র লাল চাকমা	২৪
পাহাড়ে গণ-মানুষের স্বার্থ ও আঞ্চলিক পরিষদ	মঙ্গল কুমার চাকমা	২৬

স্মৃতিচারণ

স্মৃতির পাতা থেকে	সত্যবীর দেওয়ান	২৯
মহান নেতা এম এন লারমার আত্মসংযম	অমিয় প্রসাদ চাকমা	৩১
ধুদুকছড়া আজো স্মৃতিতে অম্লান	মথুরা লাল চাকমা	৩২

যাদের আত্মবলিদান অনুপ্রেরণার উৎস

শহীদ নিখিল - এক সাহসী যোদ্ধার নাম	লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা	৩৩
মৃত্যু যাদের করেছে মহান	বিমলেন্দু চাকমা	৩৫
ক্যহলাউ ভান্তে ঃ একটি রাজনৈতিক চরিত্র	তাতিন্দ্র লাল চাকমা	৪১

কবিতা

জাতির চেতনা	পহেল চাকমা	৪৩
উত্তরসুরী	উ উইন মঙ জলি	৪৩
সে একজন	পারমিতা তংচঙ্গ্যা	৪৩
জুম পাহাড়	তনয় দেওয়ান	৪৪
মনে পড়ে	অরুমিতা চাকমা	৪৪
তালাং	লান থং সাং বম	৪৫
তাদের স্মরণে	ল্যরা চাকমা	৪৫

মন্তব্য প্রতিবেদন

খাগড়াছড়িতে এবারের সংসদ নির্বাচন	নিজস্ব প্রতিনিধি	৪৬

গল্প

নিয়তি	প্রণয় খীসা ঝিমিত	৪৮

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে আবার আমাদের মাঝে হাজির হলো জাতির সবচেয়ে শোকাবহ ও মর্মান্তিক দিন ১০ নভেম্বর। আজ জুম্ম জাগরণের অগ্রদূত, জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় লড়াকু পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিকী পূর্ণ হলো। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বরের কালো রাতে বিভেদপন্থী গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ চক্রের ষড়যন্ত্র আর ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের চরম মূল্য দিতে হয়েছে দশ ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের। এই দিনে মহান নেতা তাঁর আটজন সহযোদ্ধা শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান), অপর্ণাচরণ চাকমা (সৈকত), অমর কান্তি চাকমা (মিশুক), পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), মনিময় দেওয়ান (স্বাগত), কল্যাণময় খীসা (জুনি), সন্তোষময় চাকমা (সৌমিত্র) এবং অর্জুন ত্রিপুরা (অর্জুন) সহ শাহাদাৎ বরণ করেন। শুধু তাই নয় সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের ফলে আরো শোচনীয় ও বিয়োগান্তক ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল। অনেক মায়ের বুক খালি করে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে রচিত হয়েছিল শহীদের দীর্ঘ মিছিল। শত্রুবাহিনীর সাথে সম্মুখ লড়াইয়ে কিংবা অত্যাচারের নিপীড়নের ফলে জীবন দিতে হয়েছিল অনেক বীর বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের। আমরা এদিনে সকল বীর শহীদদের মহান আত্মবলিদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

আজকের এই শোকবহ দিনে আন্তরিকভাবে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি সকল শহীদ পরিবারের শোকার্ত সদস্যদের প্রতি। যারা রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে পঙ্গুত্ববরণ, জেলে অন্তরীণ ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি প্রকাশ করছি গভীর সহমর্মিতা।

জুম্ম জাতির আদর্শের মশাল, জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও মহান বিপ্লবী নেতা এম এন লারমা কেবলমাত্র দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে এক ধ্রুব নক্ষত্র নন তিনি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিশারী। তাঁর নেতৃত্বে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার লড়াইয়ে অকুতোভয়, সাহসী বীরেরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এক কাতারে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জনপদ প্রতিরোধ লড়াইয়ের দুর্গে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণী যখন চরম নিপীড়ন-নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলনকে রুখতে পারছিল না তখনি বেছে নেয় ষড়যন্ত্রের পথ। অন্যদিকে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলও ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। তারই ফলশ্রুতিতে পার্টির মধ্যেকার লুকিয়ে থাকা সুবিধাবাদী, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী ও সংকীর্ণ স্বার্থবাদী মহল সেই ফাঁদে পা বাড়ায় এবং তাদেরই স্বার্থান্ধ বিভেদপন্থী নীতির ফলে পার্টির মধ্যে গৃহযুদ্ধের বীজ মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। যার কারণে ১০ নভেম্বরের মতো শোকাবহ দিনের ইতিহাস জুম্ম জাতির ইতিহাসের পাতায় সূচিত হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, যুগে যুগে ষড়যন্ত্রকারী বিভেদপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিপ্লবী আর প্রগতিশীলতার মুখোশ পড়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে। আজকের সময়ে আবারও উত্থান ঘটেছে নব্য বিভেদপন্থীদের। নব্য চক্রদের সৃষ্ট ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে আজ জুম্ম জাতি এক মারাত্মক সংকটে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই আজকের এই সংকটময় দিনে ১০ নভেম্বরের শোকের চেতনা পরিণত হোক বিভেদপন্থা প্রতিরোধের দুর্বার শক্তিতে। আসুন, আমরা অধিকতর ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়ে গৃহযুদ্ধের হোতা গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চার কুচক্রীর উত্তরসূরী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করি এবং তাদের সেই প্রতিক্রিয়াশীল বিভেদপন্থী চক্রান্তের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিই। আসুন, গ্রামে গ্রামে ছাত্র-যুব-জনতার লৌহ দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিহত করি।

বিগত ১লা অক্টোবর তারিখে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে ইতিমধ্যে সরকার গঠন করেছে। গতবারের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের অভাবনীয় ভরাডুবির মাধ্যমে তারা এবার বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই প্রথম সংসদ অধিবেশন বর্জন করে নতুন করে সংসদীয় গণতন্ত্রের সংকট শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকের আশংকা দেখা দিয়েছে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ভবিষ্যৎ কি হবে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া প্রথম ভাষণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাস ও অশান্তিকর পরিস্থিতির অবসানের অঙ্গীকার করেছেন। আমরা আশা করবো নবগঠিত সরকার বাংলাদেশের ইতিহাস ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসকে সামনে রেখে চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তির দ্বার উন্মুক্ত করে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনে উদ্যোগী হবেন।

জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন বিভেদপন্থী চক্রান্ত ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

উদয়ন চাকমা

আজ ১০ নভেম্বর ২০০১ সাল জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিকী পূর্ণ হতে চলেছে। ১৯৮৩ সনের হৃদয় বিদারক সেই রক্তাক্ত ১০ নভেম্বর জুম্ম জনগণ তথা বিশ্বের অধিকারকামী নিপীড়িত জনগণ আজো ভুলতে পারেনি, কোনদিন ভুলতেও পারবে না। সেই দিনের কালো রাতে বিভেদপন্থার কি জঘন্য রূপ জুম্ম জনগণ হতবাক চিত্তে প্রত্যক্ষ করেছে। দেখেছে দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের খপ্পড়ে পড়ে পার্টি অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা বিভেদপন্থীরা উপদলীয় চক্রান্ত করে একটি নিপীড়িত নির্যাতিত জাতির মুক্তি আন্দোলনকে কিভাবে গলাটিপে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে পারে।

ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে প্রতিটি ক্ষণে মানব জাতির বিভেদপন্থা ও প্রতি বিপ্লবের সাথে মোকাবেলা করে আসতে হচ্ছে। জুম্ম জাতিও তার ব্যতিক্রম নয়। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রতিটি পর্যায়ে জুম্ম জনগণ দেখেছে কোন না কোন সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী জুম্ম জাতির রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তারা কখনো সামন্ততন্ত্রের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে কখনো বিপ্লবী লেবাস পরে নানারূপে নানা ধন্ডে জঘন্যতর প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র করেছে। চক্রান্তের প্রতিটি পর্যায়ে তারা আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং নেতা-নেতৃত্বকে হত্যা করে আন্দোলনকে স্তব্দ করার পাঁয়তারা করেছে। কিন্তু ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে জুম্ম জনগণ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি বিপ্লবী চক্রান্ত শক্ত হাতে ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে এবং চক্রান্তকারীদের অপূরণীয় ক্ষতি সামলে নিয়ে আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে এসেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ইতিহাস শোষণ নিপীড়ন ও বঞ্চণার ইতিহাস। জুম্ম জাতি যুগ যুগ ধরে সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে আসছে। জুম্ম জনগণ সেই শ্বাসরুদ্ধকর শাসন-নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভের জন্য ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে আন্দোলন করে এসেছে।

এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ স্বাধীন সামন্ত রাজার অধীনে স্বশাসনের অধিকারী ছিল। এই স্বাধীন অস্তিত্বের উপর সর্ব প্রথম আঘাত আসে দিল্লীর মোগল শাসকদের পক্ষ থেকে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মোগলরা জুম্ম জনগণের স্বাধীন সামন্ত রাজ্যের উপর আক্রমণ করে বসে। জুম্ম জনগণ মোগল শাসকদের সেই আক্রমণ বীরত্বের সাথে লড়াই করে প্রতিহত করেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই স্বশাসনের ক্ষেত্রে তারা কোন হস্তক্ষেপ করেনি।

ভারতবর্ষ দখলের এক পর্যায়ে বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে দৃষ্টি দেয়। বৃটিশরা সর্ব প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে আক্রমণ করে ১৭৭৭ সালে। জুম্ম জনগণ সেই আক্রমণ বীরত্বের সাথে প্রতিহত করতে থাকে। এরপর ১৭৭৮, ১৭৮০ ও ১৭৮২ সালে পর পর বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে জুম্মদের অভিজাত শ্রেণীর একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তৎকালীন রাজা জানবক্স খাঁ দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ১৮৭৮ সালের এক আক্রমণে জুম্মরা পরাজিত হলে বৃটিশদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। জুম্ম জাতির কাঁধে পরাধীনতার জোয়াল বস্তুতঃ তখন থেকেই ধীরে ধীরে জেঁকে বসতে শুরু করে। তখন থেকেই একের পর এক শাসনামলে ক্রমবর্ধমান হারে জুম্ম জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হতে থাকে এবং জুম্ম জনগণের স্বশাসন অধিকার লুণ্ঠিত হতে থাকে। জাতীয় জীবনে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরে নিতে হয় স্বজাতির প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশ্বাসঘাতকতারই কারণে।

১৮৬০ সালে ভারতের বৃটিশ সরকার চট্টগ্রামকে 'চট্টগ্রাম' এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' - এই দু'ভাগে বিভক্ত করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রামকে বাংলা প্রদেশের শাসনাধীনে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে "শাসন বহির্ভূত এলাকা" হিসাবে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে শাসিত হতে থাকে। পরে চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেল গঠন করে সীমিত আকারে জুম্ম জনগণের স্বশাসন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা হয়।

বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের সাম্রাজ্যভূক্ত করে নিলেও প্রাথমিক অবস্থায় জুম্ম জনগণের স্বশাসন ব্যবস্থার উপর তেমন কোন হস্তক্ষেপ করেনি। ১৮৬০ সালে ভারতের বৃটিশ সরকার চট্টগ্রামকে 'চট্টগ্রাম' এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' - এই দু'ভাগে বিভক্ত করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রামকে বাংলা প্রদেশের শাসনাধীনে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে "শাসন বহির্ভূত এলাকা" হিসাবে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে শাসিত হতে থাকে। পরে চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেল গঠন করে সীমিত আকারে জুম্ম জনগণের স্বশাসন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা হয়। অতঃপর ১৯০০ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ সাল" প্রবর্তনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিশেষ শাসন ব্যবস্থাধীনে শাসিত হতে থাকে।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে যায়। ভারত বিভক্তির মূলনীতি অনুসারে মুসলিম

অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান আর অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে ভারত। তাই জুম্ম জনগণ স্বাভাবিকভাবে আশা করেছিল যে, অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ ভারত বিভক্তির সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনসংখ্যা, যারা অমুসলিম, ছিল ৯৭.৫ শতাংশ। আর মুসলমান ও হিন্দু মিলে অজুম্ম জনসংখ্যা ছিল ২.৫ শতাংশ, তন্মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ - যার মোট মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৭,২৭০ জন। তাও আবার অর্ধেকেরও বেশী লোক ছিল ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবি। কিন্তু ইতিহাস এখানেও জুম্মদের প্রতারণা করলো। জুম্মদের একটা অংশ সেই প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশ্রেণী জুম্ম জনগণের সাথে প্রতারণা ও বেঈমানী করলো। সুবিধাবাদীতার আশ্রয় নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর সাথে গাঁটছড়া বাঁধলো।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের চক্রান্তে, তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদাসীনতা এবং সর্বোপরি জুম্ম জনগণের সামন্ত নেতৃত্বের সংকীর্ণ ও অদূরদর্শীতার কারণে শেষ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল কায়েদ-ই-আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ চট্টগ্রাম শহরে জুম্ম নেতৃবৃন্দকে এই বলে আশ্বাস দেন যে, "পাকিস্তান একটি ইসলামিক দেশ, ইসলাম সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে ইসলামের পবিত্র আমানত মনে করে। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে পবিত্রতার সাথে রক্ষা করে যাবে"। কিন্তু পাকিস্তান যেহেতু একটি ইসলামিক দেশ, তাই তার উগ্র ধর্মান্ধ খোলস বেশী দিন লুকিয়ে রাখতে পারলো না। অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী।

অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার পদক্ষেপ হিসেবে গোড়া থেকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী জুম্মদেরকে ভারতপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করলো এবং ভারতপন্থী হিসেবে ধরপাকড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করে জুম্ম জনগণের উপর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরপরই The Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation 1881-কে বাতিল করা হয় এবং পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বহিরাগত লোক পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'শাসন বহির্ভূত এলাকা'র মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। কিন্তু ১৯৬২ সালের দ্বিতীয় সংবিধানে 'শাসন বহির্ভূত এলাকা'র পরিবর্তে 'উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৬৪ সালে 'উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা'র মর্যাদাও তুলে দেয়া হয়। এতে জুম্ম জনগণ তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে। অপরদিকে শিল্পায়নের নামে পাকিস্তান সরকার কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে জুম্ম উচ্ছেদের এক জঘন্য ষড়যন্ত্র হাতে নেয়। কাপ্তাই বাঁধের ফলে এক লক্ষাধিক লোক নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে। ৫৬ হাজার একর ধান্য জমি - যা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম শ্রেণী ধান্য জমির ৪০ শতাংশ - কাপ্তাই হ্রদের জলে তলিয়ে যায়। এতে জুম্ম জনগণ চরমভাবে দিশাহারা হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ৪০ হাজার উদ্বাস্তু লোক ভারতে এবং ২০ হাজার লোকা বার্মায় চলে যেতে বাধ্য হয়।

জুম্ম জনগণের এমনি এক চরম হতাশার মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত নেতৃত্ব জুম্ম জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তারা তখন তাদের আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত নেতৃত্ব কোনদিনই জুম্ম জনগণের সাধারণ প্রজাশ্রেণীর সার্বিক মঙ্গলের জন্য ভাবেনি। সাধারণ প্রজাশ্রেণীকে অশিক্ষা-কুশিক্ষায় রেখে তাদের নির্মম শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখতে তারা বদ্ধপরিকর ছিল। ফলে জুম্ম জাতীয় জীবনে তখনো পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠতে পারিনি। '৪৭ সালে জুম্ম জনগণকে চরমভাবে প্রতারণা করে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তি, '৬০ সালে জুম্ম জাতির মরণ ফাঁদ কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ এবং ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'শাসন বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে বিশেষ শাসন ব্যবস্থার মর্যাদা তুলে দেয়া ইত্যাদি জাতীয় বিপর্যয়ের প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। জুম্ম জনগণ এসব ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের প্রতিটি মুহূর্তে গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল।

জুম্ম জাতির এহেন করুণ অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্দি করে তরুণ ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই প্রথম এগিয়ে এলেন এই নিদ্রামগ্ন জুম্ম জাতিকে নিদ্রাভঙ্গের শপথ নিয়ে। তারই নেতৃত্বে ১৯৬২ সালে সর্বপ্রথম পাহাড়ী ছাত্রদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জুম্ম ছাত্র সমাজকে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে গিয়ে জুম্ম সমাজের শিক্ষা বিস্তারসহ জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করেছিল। এম এন লারমা ৬০ সালে জুম্ম জনগণের বুকের উপর নির্মিত কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রের হীন মুখোশ উন্মোচন করে এক বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তিনি যে সাহস ও চেতনা নিয়ে সকল গতানুগতিক প্রাচীরকে ভেঙ্গে প্রতিবাদ করতে এলেন সেখানে জুম্ম জনগণের সামন্ত ও তথাকথিত অভিজাত নেতৃত্ব প্রকারান্তরে চরমভাবে বিরোধিতা করলেন। ছাত্র সমাজের একটি সুবিধাবাদীগোষ্ঠী বিশ্বাসঘাতকতা করে এম এন লারমাকে পাকিস্তান সরকারের কাছে ধরিয়ে দেন। ফলে পাকিস্তান সরকার এম এন লারমাকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত করে ১৯৬৩ সালের ১০ নভেম্বর নিরাপত্তা আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করে। তিনি দুই বছর জেল খাটার পর ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৬ সালে জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও কিছু দেশপ্রেমিক তরুণের নেতৃত্বে Tribal Welfare Association (পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি কল্যাণ পরিষদ) গঠিত হয়। এই পরিষদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ছিল জুম্ম জনগণের মধ্যে একটি প্রগতিশীল জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো। পাশাপাশি গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি'। অন্যদিকে ১৯৫৬ সালে পাহাড়ী ছাত্র সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এসব সংগঠনসমূহের মাধ্যমে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে জুম্ম জনগণের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার মহান কর্মযজ্ঞ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের পাশাপাশি প্রগতিশীল জুম্ম তরুণ সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলে ধরে।

১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল আসন থেকে মহান নেতা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি কল্যাণ পরিষদের নেতৃত্বে জুম্ম তরুণ সমাজের দেশপ্রেমিক অংশকে নিয়ে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি'। এই নির্বাচনী পরিচালনা কমিটি ১৬ দফা সম্বলিত নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। এই ইশতেহারে জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকারসহ স্বায়ত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করা হয়। এই নির্বাচনে এম এন লারমা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। এম এন লারমার নেতৃত্বে জুম্মদের তরুণ সমাজ এই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী চক্র 'পাকিস্তানপন্থী' আখ্যায়িত করে সুকৌশলে তাঁকে ও জুম্ম তরুণ সমাজকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বহু ত্যাগ তিক্ষিতার, বহু মা-বোনের ইজ্জত ও বহু মানুষের তাজা রক্তের বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ হিসেবে অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতার পর সারা দেশের বাঙালীদের মনে যেমন আশার আলো উদিত হয়েছিল তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের মনেও আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটতে না ঘটতেই মুক্তিবাহিনী তথা বাংলাদেশ সরকার 'পাকিস্তানপন্থী' আখ্যায়িত করে জুম্ম জনগণের উপর হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ধরপাকড়, লুটপাট শুরু করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বহিরাগত বাঙালী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের জায়গা-জমি বেদখল করতে শুরু করে। পাকিস্তান সরকার যা করতে সাহস করেনি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশ সরকার তা করতে মোটেও দ্বিধাবোধ করেনি। ফলে জুম্ম জনগণ চরমভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী এম এন লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' গঠিত হয়। জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য এম এন লারমা এবং মং রাজা মংপ্রুসাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে জুম্ম প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন সম্বলিত চার দফা দাবীনামা পেশ করেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যে, যে বাঙালী জাতি অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চণার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করলো, সেই দেশেরই প্রধানমন্ত্রী শহীদের রক্ত শুকাতে না শুকাতেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পদদলিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবীকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলেন।

এ সময় জনসংহতি সমিতির অঙ্গসংগঠন পাহাড়ী ছাত্র সমিতিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগ্রামের কর্মসূচী ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, জুম্ম জনগণের ষাট ও সত্তর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘুনেধরা, আন্দোলন বিমুখ ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত নেতৃত্ব এবং তার দোসর হয়ে 'যুবক সংঘ' প্রগতিশীলতার লেবাস পরে তথাকথিত অভিজাতশ্রেণীর মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবক জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিরোধিতা করতে মাঠে নামে। কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা জুম্ম জনগণ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে দেয়।

গণতান্ত্রিকভাবে অধিকার আদায়ের সকল সম্ভাবনা যখন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে তখন জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে এক রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হলে দেশে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলনের সকল পথ যখন রুদ্ধ হলো তখন জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জুম্ম জনগণের সেই সশস্ত্র আন্দোলনও গোড়া থেকেই নিষ্কন্টক ছিল না। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর পাশাপাশি জুম্ম জনগণের একটি প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর দোসর হয়ে ও দেশের কতিপয় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় জুম্ম জনগণের সশস্ত্র আন্দোলনকে গোড়াতেই গলাটিপে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। এই মুষ্টিমেয় কিছু অপরিণামদর্শী যুবক 'ট্রাইবেল পিপলস পার্টি' (টিপিপি), সর্বহারা পার্টি প্রভৃতি সংগঠনের নামে সশস্ত্রভাবে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে বাঁধা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালান। জুম্ম জনগণ সেইসব প্রতিক্রিয়াশীল মহলের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শক্ত হাতে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

জনসংহতি সমিতি সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে এভাবে যে, নীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল এবং কৌশলভাবে জাতি-ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে সাহায্য চাওয়া এবং নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করা এবং কৌশলগতভাবে দ্রুতনিষ্পত্তির লড়াই করা। এই যুগান্তকারী নীতি-কৌশলের ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে।

১৯৭৭ সালে জনসংহতি সমিতির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে এম এন লারমা পার্টি সভাপতি হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় নির্বাচিত হলেন। শুরু হলো দুর্বার গতিতে সরকারের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম। জুম্ম জনগণের লড়াকু পার্টি জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে জুম্ম জনগণ অধিকতরভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। জনসংহতি সমিতি সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে এভাবে যে, নীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল এবং কৌশলভাবে জাতি-ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে সাহায্য চাওয়া এবং নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করা এবং কৌশলগতভাবে দ্রুতনিষ্পত্তির লড়াই করা। এই যুগান্তকারী নীতি-কৌশলের ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে।

যুগে যুগে প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদীগোষ্ঠী আন্দোলনের সুযোগ বুঝে কখনো অতিশয় বিপ্লবী সংগ্রামী, কখনো প্রতিক্রিয়াশীল ও আপোষপন্থী রূপ ধারণ করে থাকে। জুম্ম জনগণের আন্দোলনও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। জুম্ম জনগণের আন্দোলনেও এসব সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও উচ্চাভিলাষী চক্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে পার্টিতে কাজ করে আসছিল। জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চার কুচক্রীও আন্দোলনে কখনো সেজেছিল প্রকৃত

দেশপ্রেমিক, কখনো সেজেছিল বিপ্লবী, কখনো বা সেজেছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী। তাদের অকালপক্কতা শানিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ও সুযোগ বুঝে কাঁধে ভর দিয়ে পার্টির কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করার হীনমানসে তারা পার্টিতে যোগ দেয়। একদিকে জাতীয় শত্রু বাংলাদেশ সরকার অন্যদিকে গৃহশত্রু সুযোগ সন্ধানীগোষ্ঠী - এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রমাগত মোকাবেলা করে এম এন লারমা ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি এগিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু বিভেদপন্থী জাতীয় বেঈমান গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র তাদের হীন মুখোশ বেশী দিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯৭৭ সালের জাতীয় সম্মেলনে তাদের সেই মুখোশ উন্মোচিত করতে চেষ্টা করে। '৭৬ সালে রেইংখ্যং অভিযানে গিরি (ভবতোষ দেওয়ান)'র চরম ব্যর্থতা, নিজেদের রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনে ব্যর্থতা, '৭৭ সালে মংলা (চাবাই মগ)'র এমএনএফ অভিযানের ব্যর্থতা, '৭৯ সালে পলাশ (ত্রিভঙ্গিল চাকমা)এর অপারেশনের শোচনীয় ব্যর্থতা, '৮১ সালে দেবেন (দেবজ্যোতি চাকমা) এর 'টি' জোন অভিযানের বিফলতা আর প্রকাশ (প্রীতিকুমার চাকমা)এর মুরুব্বিয়ানাসহ তাদের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে উক্ত সম্মেলনে তারা উপদলীয় চক্রান্তের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পাঁয়তারা শুরু করে। কিন্তু সে যাত্রায় তারা সফল হতে পারেনি।

১৯৮০ সালের ২২ জানুয়ারী জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি সন্তু লারমা জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং পার্টিতে তাঁর যোগদানের ফলে কর্মীবাহিনী নব উদ্যেমে আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে আন্দোলনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ও ক্ষমতার লোভে উচ্চাভিলাষী হয়ে, সর্বোপরি দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক গুপ্তচর ও দালালদের চক্রান্তে দুর্নীতিবাজ ক্ষমতালোভী বিভেদপন্থী চার কুচক্রী পুরোদমে শুরু করলো উপদলীয় চক্রান্ত। ১৯৮২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পার্টির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে চার কুচক্রী পার্টির নীতি-কৌশল ও নেতা-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উপস্থাপন করে এবং সশস্ত্র উপায়ে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। কিন্তু এম এন লারমার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার কারণে সেই সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়।

কিন্তু ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা সম্মেলনের রায় মেনে নিতে বাধ্য হলেও চক্রান্তের নাটক এখানেই থেমে রাখেনি। সম্মেলনের পর তারা আবার নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। অতি সঙ্গোপনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তারা পার্টির সমান্তরাল আর একটি পার্টি সৃষ্টি করে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির নাম দিল 'জাতীয় গণ পরিষদ'। এভাবে তাদের উপদলীয় চক্রান্ত ক্রমান্বয়ে জোরদার হতে লাগলো। তার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৮৩ সালের ১৪ জুনে। সেদিন চক্রান্তকারীরা কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ যখন সরিয়ে ফেলতে থাকে তখন কেন্দ্রীয় অনুগত বাহিনীর সাথে চক্রান্তকারীদের এক সংঘর্ষ বাঁধে। এভাবেই অনাকাঙ্খিত বিভীষিকাময় ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে।

গৃহযুদ্ধ ক্রমে ক্রমে চরম আকার ধারণ করে। পার্টি অনুগত বাহিনীর একের পর এক আক্রমণে এক পর্যায়ে বিভেদপন্থী চক্রদের পায়ের ভিত নড়েবড়ে হয়ে উঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে শেষ পর্যায়ে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র সমঝোতার আহ্বান জানায়। পার্টি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তথা জুম্ম জাতির মহান স্বার্থে গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'ভুলে যাওয়া ক্ষমা করা' নীতির ভিত্তিতে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী। যাদের উৎপত্তিই হলো বিশ্বাসঘাতকতা, বিভেদপন্থা ও উপদলীয় চক্রান্তের মাধ্যমে তাদের কাছে আবার সমঝোতার মূল্যই বা কি থাকে? তাই সমঝোতাপত্রের কালি শুকাতে না শুকাতেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর গভীর রাতে বিভেদপন্থীরা অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় আক্রমণ করে বসে। এই অতর্কিত হামলায় ৮ (আট) জন সহযোদ্ধাসহ মহান নেতা এম এন লারমা নৃশংসভাবে নিহত হলেন। জুম্ম জাতির ইতিহাসে হৃদয় বিদারক কালো দিবস ১০ নভেম্বর এভাবেই উৎপত্তি হলো - যা আজ অষ্টাদশ বছরে পূর্ণ হলো।

জুম্ম জনগণ দেখেছে বিভেদপন্থা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কি জঘন্য রূপ। এম এন লারমার মতো জাতির মহানায়ককে জুম্ম জাতি হারিয়েছে একমাত্র সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিভেদপন্থী চক্রান্তের কারণে। গৃহযুদ্ধের ফলে হওয়া অপূরণীয় ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং ক্ষতবিক্ষত পার্টি ও আন্দোলনকে পুনরায় সুসংগঠিত করতে জুম্ম জনগণকে কতই না মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে আজ আবার নতুন করে গৃহযুদ্ধের দামামা চলছে। জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে নস্যাৎ করে দিতে আবারও নতুন রূপে নতুন সাজে সেই বিভেদপন্থী চার কুচক্রীর উত্তরসূরী প্রসিত-সঞ্চয় নেতৃত্বাধীন নব্য চক্ররা নব উদ্যমে পাঁয়তারা শুরু করেছে।

জুম্ম জাতির ইতিহাসে সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানীর কোন শেষ নেই। গৃহযুদ্ধ অবসান করে সকল দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে যখন পার্টি আবারও আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে থাকে এবং তৎকালীন এরশাদ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের জন্য আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসতে বাধ্য করেছে সেখানেও জুম্ম জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী প্রত্যক্ষ করেছিল। পার্টি এবং সরকারের মধ্যে যখন বৈঠক চলছিল তখন ৯ (নয়) দফা রূপরেখার উচ্ছিষ্টে ভাগ বসাতে জাতীয় বেঈমানরা কোনরূপ বাছ বিচার না করে সরকারের সাথে একতরফা তথাকথিত সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ফলে তৎকালীন এরশাদ সরকারের সাথে পার্টির মধ্যেকার সংলাপ ভেঙ্গে যেতে বাধ্য হয়।

১৯৭৫ সালের পর তৎকালীন পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃবৃন্দসহ অধিকাংশ দেশপ্রেমিক জুম্ম ছাত্ররা জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে বাইরে জুম্ম সমাজের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী একটা নেতৃত্বের শূণ্যতা বিরাজ করছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত জুম্ম ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করে সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালানোর মতো ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের বিরাট ঘাটতি ছিল। দ্বিতীয়তঃ আরেকটা কারণ ছিল ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশে স্বৈরাচারী সামরিক শাসন জারি হওয়ার কারণে বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো

সংঘাতপূর্ণ এলাকার ছাত্র সমাজের পক্ষে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা মোটেও সম্ভব ছিল না। অথচ অনেক ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র - এই উভয় ধারার যুগপৎ কর্মসূচী যে কোন দেশে অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বেগবান করে তোলে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করা এবং এ লক্ষ্যে একটি সংগঠন গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

অপরদিকে জুম্মদের উপর অব্যাহত গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, নির্বিচারে ধর-পাকড় ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার এবং সশস্ত্র আন্দোলনের সহযোগী সংগঠন হিসেবে জুম্ম ছাত্র সমাজের দেশপ্রেমিক অংশের মধ্যেও সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা-চরিত্র হতে থাকে। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা-চরিত্র ও চিন্তা-ভাবনা ছিল একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক। ফলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় ছাত্র পরিষদ, ঢাকায় ট্রাইবেল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, রাজশাহীতে হিল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, কুমিল্লায় হিল ষ্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ইত্যাদি সংগঠন গড়ে উঠে। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস না থাকায় এবং অনেক ক্ষেত্রে অরাজনৈতিক চরিত্র প্রাধান্য না থাকার কারণে এসব ছাত্র সংগঠনগুলো জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তেমন কোন ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হতে থাকে।

অপরপক্ষে আশি দশকের শেষ প্রান্তে স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। দীর্ঘ প্রায় দেড় দশকের পর অন্ততঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে না হলেও দেশের অপরাপর অংশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা বিকাশ লাভ করতে থাকে।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ও সময়ের দাবীতে লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯৮৯ সনের ২০ মে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জুম্ম ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে 'পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ' (পিসিপি)-এর জন্ম হয়। ফলে বিভিন্ন পথ ও মতের ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত পিসিপি-তে শুরু থেকে মত পার্থক্য ছিল। পিসিপি'র প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সময়েই পিসিপি-তে মত পার্থক্য দেখা যায়। বর্তমান চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ'এর নেতা প্রসিত বিকাশ খীসাকে সদস্য হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে দেখা দেয় এই মতভেদ। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর অভিযোগ ছিল প্রসিত খীসার চরিত্রটাই হচ্ছে গ্রুপিং (ক্ষুদে দলবাজি) করা এবং তিনি এতই সামন্ত তান্ত্রিক যে কেউ যদি একবার তার কথার বিরুদ্ধে যায় তাহলে তাকে এমনভাবে নাজেহাল করে থাকে প্রয়োজনে সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন না। পিসিপি গঠনের পূর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র সংগঠন উপজাতীয় ছাত্র পরিষদকে দ্বিধাবিভক্ত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক বলে জানা যায়।

পিসিপি গঠনের ক্ষেত্রে পার্টির নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন ছিল পূর্ণ মাত্রায়। ফলে সশস্ত্র আন্দোলনের সাথে সমন্বয় রেখে পিসিপি'র নেতৃত্বে দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে। জুম্ম ছাত্র সমাজ পিসিপি'র পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। অপরদিকে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী গণ পরিষদ গঠন করে জুম্ম নারী সমাজ ও জুম্ম জনগণের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক অংশও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। একাধারে সশস্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দুর্বার গতি লাভ করে। পাশাপাশি পার্টি শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পথও খোলা রাখে। চার কুচক্রী সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ অবসানের পর তৎকালীন জেনারেল এরশাদ ও খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সাথে পার্টি আনুষ্ঠানিক সংলাপ চালিয়ে যেতে থাকে অব্যাহতভাবে।

কিন্তু জুম্ম জাতির দুর্ভাগ্য যে, অধিকার আদায়ের আন্দোলন যে মুহূর্তে সকল প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে শুরু করে, আন্দোলন যখন অপ্রতিরোধ্য রূপ লাভ করে তখনই আন্দোলনের বিভিন্ন ঘুর্ণিপাকে লুকিয়ে থাকা প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। পিসিপি গঠনের প্রাক্কালে প্রসিত-সঞ্চয় চক্রকে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের যে আশংকা ছিল তা বহিঃপ্রকাশ ঘটতে বেশী সময় লাগেনি। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের মতো যখনি তারা পার্টির উপর ভর করে নিজেদের অবস্থান সুসংহত মনে করলো তখনই তাদের বিভেদপন্থী ও উপদলীয় চক্রান্ত ভেসে উঠতে শুরু করে। পিসিপি'র মধ্যে দলবাজি করে ও হঠকারী কর্মসূচীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনা করতে এবং পার্টির নেতৃত্বাধীন জুম্ম জনগণের মূল আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে পার্টির অগোচরে সমান্তরাল পার্টি গড়ে তুলতে প্রসিত-সঞ্চয় চক্র ষড়যন্ত্র শুরু করতে থাকে।

পিসিপি গঠনে পার্টির নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন দানের ক্ষেত্রে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল - সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রাখা এবং দেশে বিদেশে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গঠন ও সমর্থন আদায় করা, সর্বোপরি পিসিপি'র মাধ্যমে ছাত্র-যুব সমাজকে সংগঠিত করে সশস্ত্র আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে সামিল করা। কিন্তু প্রসিত-সঞ্চয় চক্র গোড়া থেকেই ছাত্র-যুব সমাজকে সশস্ত্র আন্দোলনে সামিল করা থেকে সুচতুরভাবে এড়িয়ে যেতে থাকে। পার্টির বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনার মাধ্যেমে ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে পার্টি বিরোধী প্রপাগান্ডা চালাতে থাকে। গৃহযুদ্ধের হোতা চার কুচক্রীর মতো নিজেদের উচ্চাভিলাষ, দুর্নীতি ও ব্যর্থতা ধামাচাপা দেয়ার জন্য পার্টি নেতা-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ছিদ্রানুসন্ধান করতে থাকে। একদিকে তারা সশস্ত্র আন্দোলন ব্যতীত জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না বলে প্রচার করতে থাকে অপরদিকে সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দিতেও ছাত্র-যুব সমাজকে নিরুৎসাহিত করতো। প্রসিত-সঞ্চয়রা প্রায়ই বলে থাকে যে, 'জনসংহতি সমিতি একটি ভাঙ্গা নৌকা বৈ কিছু নয়। এই নৌকায় যে পা দেবে সে ডুবে যাবে বলে ছাত্রদের বুঝাতো। কিন্তু পার্টিতে ছাত্র-যুব সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই নৌকাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তারা বরাবরই বিরোধিতা করে থাকতো। একদিকে তারা বিভিন্ন কর্মসূচীর জন্য গাদা গাদা টাকা পার্টি থেকে নিয়ে আসতো অপরদিকে পার্টির বিরুদ্ধে এসব অপপ্রচার চালিয়ে পার্টি নেতৃত্বাধীন আন্দোলনকে নস্যাৎ করা অপচেষ্টা চালাতে থাকে।

প্রসিত-সঞ্চয় চক্র নব্বই দশকেরমাঝামাঝি সময় থেকেই একটি স্বতন্ত্র পার্টি গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। '৯৫ সালের

ডিসেম্বর মাসে তারা একতরফাভাবে 'পাহাড়ী গণ পরিষদ' (পিজিপি) এর নাম পরিবর্তন করে জুম্ম 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' নামে একটি পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু পাহাড়ী গণ পরিষদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার মুখে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তখনই প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে জুম্ম ছাত্র-জনতার মধ্যে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। পরবর্তীতে '৯৬ সালের ১২ জুলাই পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য প্রসিত একটা খসড়া স্মারকলিপি উপস্থাপন করেন। তাতে লেখা হয় যে, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকে বৈঠকে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে এবং সেই বৈঠকে পিসিপি, পিজিপি, এইচডব্লিউএফ এই তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক রাখতে হবে"। তখন পিসিপি'র তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মৃগাঙ্ক খীসা সরকার কার সাথে বৈঠকে বসে সামাধান করবে এটা স্পষ্ট নয় এবং সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতির নাম উল্লেখ করতে হবে এবং তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক দাবী করা যুক্তিযুক্ত হবে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সেদিন জনসংহতি সমিতির নাম সংযোজনে সহজে রাজী না হলেও অনেক যুক্তি-পাল্টা যুক্তি দেওয়ার পর প্রসিত চক্র শেষ অবধি সংযোজন করতে বাধ্য হয়। এভাবেই প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের পার্টি বিরোধী তৎপরতা প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্র-যুব সমাজ নস্যাৎ করে দেয়।

প্রসিত-সঞ্চয় চক্র বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সংগঠন পরিচালনা করতো। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম, হিল লিটারেচার ফোরাম এর মধ্যে অন্যতম। হিল লিটাবেচার ফোরামের থেকে 'রাডার', 'স্যাটেলাইট', 'জুম্মকণ্ঠ' প্রভৃতি মুখপত্র বের করা হতো। এসব মুখপত্র পিসিপি'র মাধ্যমে বিক্রি ও বিলির ব্যবস্থা হলেও এসব মুখপত্রের উপর পিসিপি ও পিজিপির কোন এখতিয়ার ছিল না।

প্রসিত খীসার প্রচন্ড একগুয়েমী, একতরফা ও হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং কর্মসূচী, সর্বোপরি স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের কারণে খোদ পিসিপি-তেও তার তেমন কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। প্রসিত-সঞ্চয় চক্র কর্তৃক গ্রুপিং চক্রান্ত চালুর আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন শাখায় ন্যাক্কারজনক দলবাজী দেখা যেত না। প্রসিত-সঞ্চয় চক্র এই উপদলীয় চক্রান্ত যখন অন্যান্য স্থানেও সংক্রামিত হতে থাকে তখন থেকেই সর্বক্ষেত্রে এর কুপ্রভাব পড়তে থাকে। ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বক্ষেত্রে ন্যাক্কারজনকভাবে গ্রুপিং ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে থাকে প্রসিত চক্র। তার এই গ্রুপিংএর ফলে পিসিপি'র মধ্যে কার্যতঃ দুটি ধারার জন্ম নেয়। একটি ধারা প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের অনুসারী যাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। আরেক ধারা হচ্ছে একটি প্রসিত বিরোধী ধারা। এই ধারাকে বলা হলো বিক্ষুব্দ অংশ। প্রসিত চক্র এই অংশের নাম দেয় দালাল চক্র বা মোনঘর চক্র। কিন্তু প্রসিত চক্রের এতই দুর্ভাগ্য যে, এভাবে দুটি ধারা সৃষ্টির পর থেকেই প্রসিত চক্র খাগড়াছড়ি শাখা ব্যতীত রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়, মহানগর ও জেলা শাখায় প্রসিত অনুসারী প্যানেল জয়যুক্ত হতে পারেনি। গ্রুপিং মাধ্যমে মরিয়া হয়ে চেষ্ঠা চালালেও '৯৫ ও '৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগর শাখাসহ বিভিন্ন শাখা সম্মেলনে প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের প্যানেল বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। এমনকি প্রসিত খীসা স্বয়ং চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র হয়েও উক্ত শাখায় প্রসিতের বোন বিকশিতা খীসা ব্যতীত প্রসিত চক্রের কোন প্রার্থীই কোন কালেই জয়যুক্ত হতে পারেনি।

'৯৬ সালের ৯ আগষ্ট ঢাকা মহানগর শাখার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রসিত চক্রের নেতৃত্বাধীন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সঞ্চয়সহ একসাথে ৭ (সাত) জন ব্যক্তি পদত্যাগ করার ঘটনাটি অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেদিন উক্ত শাখার নির্বাচনে প্রসিত চক্রের প্যানেল বিপুল ভোটে পরাজয় বরণ করে। কিন্তু প্রসিত চক্রের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা সে ফলাফল মেনে নিতে রাজী ছিল না। তারা বিভিন্ন তুচ্ছ অজুহাতে প্রতিপক্ষ প্যানেলের পক্ষে প্রদত্ত ৬৪টি ভোট বাতিল করে দিতে জেদ ধরে। ঐ ৬৪টি ভোট বাতিল হলে তবেই প্রসিত চক্রের প্যানেল জয়ী হতে পারে। তাই তাদের এই অগণতান্ত্রিক একগুয়েমী দাবী। এক পর্যায়ে সেসব ভোট বাতিল করতে ব্যর্থ হলে প্রসিত চক্রের অনুসারী কেন্দ্রীয় কমিটির উক্ত সদস্যরা পদত্যাগ করে। এই পদত্যাগ যে হঠকারী ছিল তা তারা পরবর্তীতে টের পেয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে সময় অনেক গড়িয়ে যায়। তাই বিভিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে পদত্যাগকারীদের পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষ গ্রুপের উপর চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পদত্যাগকারীদের পুনর্বহালের ব্যবস্থা নিতে হয়।

প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের প্রচন্ড উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতালিপ্সার কারণে ১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পিসিপি তথা তিন সংগঠনের (পিসিপি-পিজিপি-এইচডব্লিউএফ) মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তি ও অন্ত র্দ্বন্দ্ব, পাশাপাশি পার্টির সাথে প্রসিত চক্রের মত পার্থক্য চরম আকার ধারণ করে। নির্বাচনে চক্রান্তের হোতা প্রসিত খীসা স্বয়ং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর। পার্টি ও পিসিপি'র অপর বৃহত্তর অংশটির অভিমত হচ্ছে ১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালে এম এন লারমা যে পরিস্থিতিতে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন সেই পরিস্থিতি আর পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই। হাজার হাজার সেটেলার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তাই জুম্ম জনগণের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তি তেমন আর মজবুত নয়। অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের নিমিত্তে '৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের মতো বাংলাদেশের সহানুভূতিশীল কোন রাজনৈতিক দল - যে দল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের অঙ্গীকার করবে সেই দলের প্রার্থীকে সমর্থন দানের নির্বাচনী কৌশল অবলম্বন করার পক্ষে পার্টি মত প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে বিশেষতঃ আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে সমর্থন দানের কথা বলা হয়। কিন্তু প্রসিত-সঞ্চয় চক্র সেই সিদ্ধান্তকে অমান্য করে খাগড়াছড়ি থেকে প্রসিতের বারা অনন্ত বিহারী খীসাকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এভাবেই প্রসিত চক্র পার্টির সিদ্ধান্তের বাইরে বিভিন্ন হঠকারী সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী নিতে থাকে।

প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সমান্তরাল পার্টি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র আরো স্পষ্ট হয় যখন তারা পিসিপি নেতা-কর্মীদেরকে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক বিচার-আচারে হস্তক্ষেপ করার হঠকারী কর্মসূচীর ঘোষণা করে। পিসিপি'র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর বাইরে প্রসিত চক্র পিসিপি'র কর্মকান্ডকে সম্প্রসারিত করার ফলে জুম্ম জনগণের কাছে পিসিপি'র ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হতে থাকে। এতে পিসিপিকে তার সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনে হঠকারী কর্মসূচীর পথে ঠেলে দেয়। এর ফলে খোদ পিসিপিসহ তিন সংগঠনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাই পার্টি পক্ষ থেকে প্রসিত-সঞ্চয় চক্রকে এসব হঠকারী

কর্মসূচী থেকে সরে আসার আহ্বান জানানো হয়। পার্টির সাংগঠনিক নীতি হচ্ছে "শত্রুকে নিরপেক্ষ করা, নিরপেক্ষকে সক্রিয় করা এবং সক্রিয়কে পার্টির আশা-আকাংখার প্রতীক" হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু প্রসিত-সঞ্চয় চক্র পার্টির এই সাংগঠনিক নীতিকে লংঘন করে হঠকারী কর্মসূচী গ্রহণ করতে থাকে। খাগড়াছড়িতে এরকম একটা বিচার অনুষ্ঠিত করে কয়েকজন যুবককে অমানুষিক মারধর করার পর কেবলমাত্র জাঙ্গিয়া পরে যীশু খৃষ্টকে যেভাবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় সেভাবে ঝুলিয়ে রেখে "চোর প্রদর্শন" করা হয় এবং দালাল তালিকা প্রস্তুতের নামে বাস্তবতা অনুপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ ও নিজের ঘনিষ্টজন ও আত্মীয়দের সেই তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। এভাবে ছাত্র সমাজের তথা সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাকে মূল কর্মসূচী থেকে সরে নিয়ে বিপথে ও হঠকারীতার দিকে ফেলে দিতে থাকে প্রসিতচক্র।

'৯৩-এর ১৭ নভেম্বর নানিয়ারচর গণহত্যার মূলে প্রসিতের একগুয়েমী ও হঠকারীতাই দায়ী বলে মনে করতেন তৎসময়ে ঢাকাস্থ বেশীর ভাগ সচেতন ছাত্ররা যারা ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানে। ১৭ নভেম্বর নানিয়ারচরে যাত্রী ছাউনি সেনামুক্ত করার কর্মসূচীর ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়। প্রসিত অনেক যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করতে থাকে কেন সেই কর্মসূচী পালন করা উচিৎ। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা যুক্তি দেন যে, নানিয়ারচরের যাত্রী ছাউনি সেনামুক্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনামুক্ত হবে না। পিসিপির আন্দোলন নির্দিষ্ট কোন সেনা ছাউনির বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেনা ক্যাম্প ও সেনা শাসনের বিরুদ্ধে। নানিয়ারচর বাজারের অবস্থানগত কারণেও এই কর্মসূচী বাতিল করা উচিৎ বলে অনেকে অভিমত দেন। এছাড়াও ১৭ নভেম্বর বুধবার নানিয়ারচরের বাজার দিন। দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে নীরিহ মানুষ বাজারে আসবে, কোন কারণে সংঘর্ষ বাধলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যুক্তি দেয়ার পরও প্রসিত তার দেয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার পক্ষে নয়। ১৫ নভেম্বর নানিয়ারচর থেকে ফোন করা হয় ঢাকায়। এতে জানানো হয় - নানিয়ারচেরর পরিস্থিতি থমথমে - ১৭ তারিখের কর্মসূচী পালন করলে সংঘর্ষ অনিবার্য, সেনাবাহিনী বহিরাগত বাঙালীদের প্রস্তুত রেখেছে হামলার জন্য। টিএনও ইতিমধ্যে নানিয়ারচর থেকে বাড়ীতে চলে গেছে, ১৭ তারিখের আগে নানিয়ারচরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে তারা কর্মসূচী বাতিল করবে কিনা জানতে চান। কিন্তু প্রসিত কোন অবস্থায় বাতিল হবে না বলে জানিয়েছেন। কর্মসূচী পালিত হলো, পিসিপির মিছিলে বহিরাগত বাঙালী হামলা করলো। ফলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বহিরাগত বাঙালীরা যখন পারছে না তখনই সেনাবাহিনী গুলি চালালো। সেনাবাহিনীর গুলি ও বাহিরাগত বাঙালীদের হামলায় গ্রাম থেকে আসা অনেক নীরিহ পাহাড়ী দিন দুপুরে মারা গেলেন। পুড়িয়ে দেয়া হলো পাহাড়ীদের ঘরবাড়ী। দুএকদিনের মধ্যে লেইকের মধ্যে ভেসে উঠলো একের এক পাহাড়ী লাশ। রচিত হয়ে গেলো পার্বত্য চট্টগ্রামে আরেকটি জঘন্যতম গণহত্যা।

এসব হঠকারী কর্মসূচী ও বিভেদপন্থী কার্যক্রম থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং পিসিপি'র মধ্যে বিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব রোধকল্পে পার্টির পক্ষ থেকে, বিশেষতঃ পার্টির সভাপতি সন্তু লারমা প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সাথে বারবার ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করেন। এমনকি পার্টির পক্ষ থেকে চুক্তির ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সাথে এ বিষয়ে ম্যারাথন আলোচনা করা হয়। মোট কথা পার্টির পক্ষ থেকে পিসিপি ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সব আলোচনা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের বিভেদপন্থা, সংগঠন ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া ও সর্বোপরি সমান্তরাল পার্টি গঠনের গোপন কর্মসূচী থেকে সরে আসেনি। এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের ক্ষমতার প্রচন্ড উচ্চাভিলাষ ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা।

বস্তুতঃ এভাবেই পিসিপি তথা ছাত্র-যুব সমাজের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রসিত-সঞ্চয় চক্র ধীরে ধীরে দ্বিধা-বিভক্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দেয়। সংগঠনের মধ্যে এই দ্বিধা-বিভক্তি স্পষ্টতর হয় ১৯৯৭ সালের ১০ মার্চ সংগঠনের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই অগণতান্ত্রিক ও একতরফাভাবে প্রসিত-সঞ্চয় চক্র পিসিপি-পিজিপি-এইচডব্লিউএফ - এই তিন সংগঠনের নামে "পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন"এর ডাক দিয়ে একটি প্রচারপত্র বিলি করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেদিন তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে ঢাকায় একটি মিছিল করা হয়। মিছিল চলাকালে জুম্ম জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী উক্ত প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এরপর ২০-২১ এপ্রিল '৯৭ চট্টগ্রাম বুড্ডিষ্ট ফাউন্ডেশন মিলনায়নে পিসিপি'র কেন্দ্রীয় বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অধিকাংশ প্রতিনিধি পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটি তথা তিন সংগঠনের অনুমোদন ছাড়া 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' এর ডাক দেয়াকে তীব্র সমালোচনা করে। অবশেষে 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' এর দাবীকে বাদ দিয়ে নিম্নোক্ত মৌলিক চারটি দাবীকে সামনে রেখে ১৭-২০ জুন '৯৭ পিসিপি'র ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঢাকায় বা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়। দাবীগুলো হলো -

১। সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে।
২। ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৩। সেনাবাহিনী ও সেনা ক্যাম্প তুলে নিতে হবে।
৪। বহিরাগত সেটেলারদের ফেরত নিতে হবে।

উক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রসিত চক্র 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' এর দাবী অনুমোদন করে নিতে ব্যর্থ হয়ে অগণতান্ত্রিক পথে পা বাড়ায়। তারা ৬ জুন চট্টগ্রাম ট্রাইবেল ষ্টুডেন্ট হোষ্টেলে পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভা আহ্বান করে। উক্ত সভায় পিসিপি'র গঠনতন্ত্রকে লঙ্ঘন করে প্রসিত চক্র প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' এর শ্লোগান অন্তর্ভূক্ত করে নেয় এবং ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের স্থান খাগড়াছড়ি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। পিসিপি'র গঠনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের কোন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি পরিবর্তন করতে পারে না। এই অগণতান্ত্রিক ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিটি শাখায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং প্রতিটি শাখা থেকে প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বলবৎ রাখার দাবী জানানো হয়। ৭টি জেলা মর্যাদা সম্পন্ন শাখার মধ্যে ৫টি শাখা থেকে পুনরায় প্রতিনিধি সম্মেলন ডেকে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য দাবী করা হয়। উল্লেখ্য যে, গঠনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সিদ্ধান্ত বিষয়ে ২টি জেলা মর্যাদা সম্পন্ন শাখা থেকে দ্বিমত পোষণ করা হলে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিনিধি সম্মেলন ডেকে বিতর্কিত বিষয়টি নিস্পত্তি করতে বাধ্য। কিন্তু কে শুনে কার বাণী। যারা গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করে না, যাদের চরিত্রটাই বিভেদ আর ষড়যন্ত্র তাদের কাছে গঠনতন্ত্রের মূল্যই বা কি থাকে। পিসিপি'র তৎকালীন সভাপতি ও প্রসিতের দক্ষিণ হস্ত সঞ্চয় চাকমা ঘোষণা দেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটিসহ শাখা থেকে কেউ না গেলেও তিনি একাই 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' এর দাবী নিয়ে ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত করবেন। এমনকি বোমা ফেললেও তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না।

ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়িতে ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের স্থান স্থানান্তরের আরেকটি প্রধান কারণ ছিল নির্বাচনে প্রসিত চক্রের অনুসারী প্যানেল না জেতার আশংকা। একে একে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি শাখা কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রসিত চক্রের প্যানেল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে থাকে। ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তাদের অনুসারী প্যানেল ভরাডুবি হবে এটা এক প্রকার নিশ্চিত ছিল। তাই তারা অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী নীতি গ্রহণ করে। তাদের একমাত্র সংগঠন ছিল খাগড়াছড়িতে। তাও আবার ধরে রেখেছিল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে। তাই গঠনতন্ত্র পরিপন্থীভাবে এবং অগণতান্ত্রিক উপায়ে কাউন্সিলের স্থান ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়িতে স্থানান্তার করে। খাগড়াছড়ি নিতে পারলে তারা আগের মতো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং অবৈধ ভোটার ঢুকিয়ে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করতে পারবেন এ আশায়। তারা একই পন্থা অবলম্বন করেছিল খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলেও। সেই কাউন্সিলে প্রথম থেকেই কাউন্সিলর সংখ্যা ছিল ১৪২ জন। কিন্তু শেষ দিনে - যে দিন কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন হবে - হঠাৎ এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৩-এ। গণতান্ত্রিক ও পদ্ধতিগতভাবে নির্বাচন হলে তাদের প্যানেলের ভরাডুবি হবে এটা আন্দাজ করতে পেরে তারা শেষ দিনে খাগড়াছড়ি ও বাঘাইছড়ি থেকে যদু মধু শাখার নাম দিয়ে (যেখানে আদৌ কোন শাখা এর আগে গঠন করা হয়নি) ২১ জন অবৈধ কাউন্সিলর হঠাৎ করে নিয়ে আসে। আর সেই কাউন্সিলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী, বান্দরবান প্রতিনিধিদের এমনভাবে চোখে চোখে রাখা হতো যেন তারা আসামী। কাউন্সিলে ঢোকার সময় ব্যাগগুলো নিয়ে যাওয়া হতো দপ্তরে জমা রাখার কথা বলে। প্রস্রাব করতে গেলেও কমপক্ষে একজন স্বেচ্ছাসেবক সাথে যাবেই যাতে অন্য কারো সাথে কথা বলা না যায় ইত্যাদি। এভাবেই সন্ত্রাস ও মাস্তান দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে প্রসিত চক্র ৬ষ্ঠ কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় কমিটি দখল করে নেয়। সেই একই উদ্দেশ্যেই ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের স্থানও প্রসিত চক্র খাগড়াছড়িতে স্থানান্তর করে থাকে।

অতঃপর প্রসিত-সঞ্চয় চক্র ১৭ জুন খাগড়াছড়িতে পিসিপি'র একটি অতি ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকা ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত করে। প্রসিত চক্রের উক্ত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকা ও কাউন্সিলে একমাত্র খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, পানছড়ি (একাংশ) ও মহালছড়ি এবং রাঙ্গামাটি জেলার কুতুকছড়ি ও নানিয়ারচর শাখার কিছু ছাত্র যোগ দেয়। পক্ষান্তরে ১৮ জুন পিসিপি'র অপর বৃহত্তর ও মূলধারার অংশটি অপরাপর সকল শাখার প্রতিনিধি নিয়ে চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্রাবাসে বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন আয়োজন করে এবং প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১-২ জুলাই '৯৭ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্পন্ন করে থাকে। এভাবে প্রসিত-সঞ্চয় চক্র জুম্ম ছাত্র সমাজের প্রাণপ্রিয় লড়াকু সংগঠন পিসিপি'কে দ্বিখন্ডিত করে জুম্ম জাতির ইতিহাসে বিভেদ ও অনৈক্যের আরো একটি কালো অধ্যায় সংযোজিত করে থাকে।

বিভেদপন্থীদের চাতুকারিতা এতই জঘন্য ও ন্যাক্কারজনক যে, নিজেদের অপকর্ম ধামাচাপা দেয়ার জন্য বরাবরই অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে থাকে। প্রসিত-সঞ্চয় চক্র বরাবরই বলে থাকে জনসংহতি সমিতিই পিসিপি'র মধ্যে বিভেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিয়েছে। অথচ প্রকৃত ঘটনা এই যে, প্রসিত-সঞ্চয় চক্রই পার্টিকে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে থাকে। জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বার্থে ছাত্র সমাজের ভাঙ্গন রোধকল্পে পার্টির পক্ষ থেকে প্রায়ই প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত প্রতিপক্ষ ছাত্র অংশের উপর চাপিয়ে দিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। অপরদিকে প্রসিত-সঞ্চয় চক্র পার্টির সামরিক শাখার নামে প্রতিপক্ষ ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বেনামী চিঠি দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দিয়ে এসেছে যাতে এসব নেতৃবৃন্দ সংগঠন থেকে সরে যায় এবং তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। ফলে অনেক প্রতিভাবান ছাত্র নেতা ও কর্মী বিভেদ ও কোন্দলে না গিয়ে নীরবে নিভৃতে পিসিপি থেকে সরেও গিয়েছিল।

প্রসিত-সঞ্চয় চক্র কেবলমাত্র পিসিপি অভ্যন্তরে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টিতে তৎপর ছিল তাই নয়, তারা পার্টির মধ্যেও বিভেদ ও ভাঙ্গনের ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্টি ও সরকারের মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে ও পরে পার্টির ভেতরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে প্রচার করে যে, পার্টির মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশ তাদের পক্ষে রয়েছে। তারা চুক্তি মানছে না। তারা সন্তু লারমার সাথে বিদ্রোহ করেছে এবং তারা অস্ত্র জমা দেবে না। তারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। একেবারে সেই চার কুচক্রীর কায়দায় তারা এই অপপ্রচার ছড়িয়ে দেয়। দক্ষিণাঞ্চলে গিয়ে পার্টি কর্মীদের নিকটও এই অপপ্রচার ছড়িয়ে দেয় এবং আহ্বান করে সেই তথাকথিত বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে যোগ দিতে। কিন্তু পার্টিকে তারা চিনেনি বলে তাদের এই "এহ্‌দো কিয়াত হুগুরে ভূগে পা" (হাতিকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ করা) অপপ্রয়াস। একটি সশস্ত্রবাহিনীতে উপদলীয় চক্রান্ত করার পরিণাম কি হতে পারে জানে না বলেই তারা শিশুর মতো এ আচরণ করেছে। একদিকে পার্টির সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে কঠোর সামরিক শৃঙ্খলা ছিল বলে তাদের "ঘেউ ঘেউ"তে পার্টির অভ্যন্তরে কোন আঁচড় বসাতে তারা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে কুকুর কামড় দিয়েছে বলে মানুষও প্রসিত-সঞ্চয়দের চরিত্র সংশোধনের লক্ষ্যে পার্টির পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমুলক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপ চুক্তি বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করুক তাতে তেমন কোন আপত্তি নেই। তারা 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' আনুক তাতে আরও মঙ্গল জুম্ম জাতির জন্য। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন (?) কেন, কে না চায় স্বাধীনতাও? 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' দাবী করার কিংবা চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার যেমন তাদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তেমনি জনসংহতি সমিতি বা যে কোন জুম্মেরও চুক্তিকে সমর্থন করার বা চুক্তির পক্ষে কথা বলার পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় চক্র কেবলমাত্র তাদের বেলায় গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী করে, অপরকে সেই অধিকার ভোগ করতে দিতে তারা চায় না। তাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথে জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের খুন করার কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই (জনসংহতি সমিতির সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনে আসার আগে) তারা পানছড়িতে সুনেন্দু বিকাশ চাকমা রেনন এবং প্রাণময় চাকমা সুজন নামে জনসংহতি সমিতির দু'জন সদস্যকে সশস্ত্র আক্রমণ করে। জখম হয়ে তাদের খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

১৮ জানুয়ারী '৯৮ নানিয়ারচর থানা অন্তর্গত কুতুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির সমর্থক অশ্বিনী কুমার চাকমাকে কুপিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর চারজন সঙ্গী নিয়ে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সত্যবীর দেওয়ান নানিয়ারচর থানার

ঘিলাছড়িতে সাংগঠনিক সফরে গেলে তাদেরকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এভাবেই জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের উপর খুন, অপহরণ, মারধর, হুমকি ইত্যাদি সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে প্রসিত-সঞ্চয় চক্র পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন আদায় ও চুক্তি বিরোধিতা করতে শুরু করে। আজ অবধি চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সশস্ত্র সন্ত্রাসী হাতে পার্টির ৩৮ জন সদস্য ও সমর্থক খুন হয়েছেন এবং এক শতাধিক সদস্য ও সমর্থককে তারা অপহরণ করে।

শুধু তাই নয়, ২৪ মে ১৯৯৯ তারা জুম্ম জাতীয় জীবনে আরো একটি ১০ নভেম্বর রচনাও করতে ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। সেদিন জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা সন্তু লারমাকে খাগড়াছড়ি থেকে রাঙ্গামাটি আসার পথে খাগড়াছড়ি বিজিতলা নামক স্থানে তাঁকে বোমা মেরে হত্যা করার চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যেই প্রসিত-চক্র পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নানা ডিগবাজি প্রদর্শন করেছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১ সাল নানিয়ারচর থানার গুনিয়া পাড়া স্থান থেকে তিন বিদেশী প্রকৌশলীকে অপহরণ করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত করা, মুক্তিপণ আদায় করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কৃত্রিম ভিত্তি গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মহড়া করেছে। একমাস ধরে দীর্ঘ মঞ্চায়নের পর ১৭ মার্চ যেভাবে ও যে কায়দায় তিন বিদেশী প্রকৌশলীকে মুক্তি দেয়া হলো তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এই অপহরণ নাটকের পেছনে তৎকালীন সরকারী এমপিসহ সেনাবাহিনী, প্রশাসন ইত্যাদি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল এবং এসব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সাথে প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের যে গোপন আঁতাত গড়ে উঠেছে সেবিষয়ে আর কারো সন্দেহ রইল না।

অতি সম্প্রতি ৮ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রসিত-সঞ্চয় চক্র আরেকটি বড় ধরনের ডিগবাজি প্রদর্শন এবং প্রহসন মঞ্চায়ন করেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রথমেই তারা ১ আগষ্ট ২০০১ খাগড়াছড়ি স্বনির্ভর এলাকায় একটি সমাবেশের আয়োজন করে। প্রকাশ্য এই সমাবেশ চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র গ্রুপের নেতা সঞ্চয় চাকমা ঘোষণা করলেন "আমরা চুক্তি বিরোধী নই"। সমাবেশে বিলি করা প্রচারপত্রে "স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা" প্রণয়নের দাবীও তারা করলো। এমনকি ১৬ আগষ্ট ২০০১ তারিখ চুক্তি বাস্তবায়নসহ কতিপয় দাবী নিয়ে জনসংহতি সমিতির ডাকা হরতালে সমর্থনও জানিয়ে থাকে। প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের কি চমৎকার ডিগবাজি। গোড়া থেকেই তারা চুক্তি মানে না এবং চুক্তির পরিবর্তে 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' আদায়ের ডাক দিয়েছে। আর এখনি এসে বলছে তারা চুক্তি মানে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে সমর্থন দেবে। অবশ্য তাদের সেই ডিগবাজি জুম্ম জনগণের কাছে স্পষ্টতর হতে বেশী দিন লাগলো না। বিভেদপন্থী চক্রান্তের নাটের গুরু প্রসিত বিকাশ খীসার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

নির্বাচনে সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি প্রথমেই তারা দিয়েছিল পার্বত্য চট্টলার আরেক প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী নেতা শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমাকে। তাই উপেনবাবু গাড়ী, অর্থ, লোকবল (এমনকি নিজের কনিষ্ঠ ছেলেকেও) দিয়ে বেশ ঘটা করে উক্ত ১ আগষ্টের সমাবেশে সাহায্যের হাত বাড়ায়। পাশাপাশি তারা মারমা উন্নয়ন সংসদের কতিপয় নেতৃবৃন্দকেও নির্বাচনে সমর্থন দানের পূর্ণ ওয়াদা প্রদান করে। আর অন্যদিকে 'শান্তিচুক্তির রূপকার' 'দীঘিনালার স্বঘোষিত কৃতি সন্তান' শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমা তো আছেনই। প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি তাদেরকে জানপ্রাণ দিয়ে ছায়ার মতো আগলে রেখে আসছেন। কিন্তু শত প্রতিশ্রুতি দেয়া হোক, প্রসিত বেটা তার উচ্চাভিলাষ সংবরণ রাখবেন কেন? তাই চক্র গং-এর অভ্যন্তরস্থ সকল মতামতকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে তিনি স্বয়ং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন। কারণ তার চরিত্রটাই হচ্ছে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা, সর্বোপরি প্রচন্ড উচ্চাভিলাষ। জুম্ম স্বার্থ ও চুক্তি পরিপন্থী ভোটার তালিকা দিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের কাছে স্পষ্ট হলো তাদের সেই 'চুক্তি বাস্তবায়নে সমর্থন দান' কিংবা 'স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবী' ভাওতা ছাড়া কিছুই নয়।

আর ভোট ডাকাতিতে দেখালো আরেক নজিরবিহীন উদাহরণ। নির্বাচনে তারা প্রমাণ করলো, জুম্ম জনগণের ভোটাধিকার হরণ করতেও তারা সিদ্ধহস্ত। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যেমন - খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, দীঘিনালা ও লক্ষীছড়ির কতিপয় এলাকা এবং রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর ও কাউখালী এলাকায় অস্ত্রের মুখে জনগণকে তাদের তীর-ধুনুক মার্কায় ভোট দানে বাধ্য করেছিল। ক্ষেত্র বিশেষে গ্রামবাসীদের শারীরিকভাবে মারধর ও অপহরণেরও আশ্রয় নিলো। তাতেও তাদের কাঙ্খিত ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সশস্ত্র সদস্যদের জনে জনে শত শত জাল ভোট দিতে হয়। কারণ নির্বাচনে প্রত্যাশিত ভোট আদায় করা না গেলে প্রসিতের ভাবমুর্তি ও দলের অস্তিত্বের প্রেষ্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে। আর তাদের সেই জাল ভোট প্রদানে নির্বাচন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সরকারী প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। নির্বাচনের আগে তারা ঘোষণা দেয় যে, যারা তীর-ধুনুক মার্কায় (প্রসিত খীসার নির্বাচনী মার্কা) ভোট দেবে না তাদের করুণ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে এবং যে সকল কেন্দ্রে তীর-ধুনুক সর্বোচ্চ ভোট পাবে না সে সকল এলাকায় বাড়তি ট্যাক্স আরোপ করা হবে। নির্বাচনের পরই প্রসিত চক্র সেই ঘোষণা কঠোরভাবে কার্যকর করে যাচ্ছে। খাগড়াছড়ির ৫ মাইল, ৯ মাইল, শিবমন্দির, কুকিছড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়তি ট্যাক্স আদায় করছে। এমনকি হাঁস-মুরগী, কলাছড়া, মোড়া, বেতের তৈরী জিনিষপত্র ইত্যাদি ছোটখাটো মালামালও এই ট্যাক্স থেকে বাদ যাচ্ছে না।

জনসংহতি সমিতি স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবীতে অনড় থাকে এবং এলক্ষ্যে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের ডাক দেয়। সমিতির এই আহ্বানে জুম্ম জনগণ ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিল। রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি, বিলেইছড়ি ও রাজস্থলী থানার প্রায় ১৫টি কেন্দ্রে কোন ভোট পড়েনি। খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি ও দীঘিনালা থানার কয়েকটি কেন্দ্রেও কোন ভোট পড়েনি। আর অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক (৫-২০টির মধ্যে) ভোট পড়েছে এমন কেন্দ্র রয়েছে অনেক। বিশেষতঃ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ৮০ শতাংশ জুম্ম জনসংহতি সমিতির নির্বাচন বর্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভোট দান থেকে বিরত থাকে। জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীরা প্রতিটি অঞ্চলে তাদের নির্বাচন বর্জনের কর্মসূচী নিয়ে গণসংযোগ করেছে। প্রসিত-সঞ্চয় চক্র সমিতির এই গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরও নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়ে সমিতির আয়োজিত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১ গণ সমাবেশে লোকজনকে

আসতে বাধা দিয়েছে। এলাকা ভিত্তিক গণ সংযোগ কালে পার্টির নেতা-কর্মীদের হুমকি দিয়েছে। নির্বাচন বর্জনের পক্ষে গ্রামবাসীদের সংগঠিত করার অপরাধে পানছড়ি থানার পুজগাং গ্রামে পার্টি সদস্য মঙ্গল সুন্দর চাকমা ও নিশিরাম চাকমাকে প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সশস্ত্র সদস্যরা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে গৃহবন্দী করে রাখে।

শুধু তা নয়, নির্বাচনোত্তর কালেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রসিত-সঞ্চয় চক্র নির্বাচনী সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনের পরপরই তীর-ধুনুক মার্কায় ভোট না দেয়ার অপরাধে কমলছড়িতে কালাধন চাকমা ও বীরবাহু চাকমাসহ বেশ কয়েকজনকে মারধর করেছে, কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছে। ৬ অক্টোবর ২০০১ নির্বাচন বর্জনের পক্ষে সংগঠন করার অপরাধে লক্ষীছড়ির রাঙ্গাপানি এলাকা সমিতির সদস্য চন্দ্র চাকমা (অমরজিৎ) কে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি। আত্মীয়-স্বজনের মতে তাকে খুন করা হয়েছে। তার পরপরই মহালছড়ি থানা থেকে ৪ জন কর্মীকে অপহরণ করে। ২৪ অক্টোবর খাগড়াছড়ির নারানখিয়ে এলাকা থেকে পিসিপি'র থানা পর্যায়ের নেতা শুভাশীষ চাকমাকে অপহরণ করে।

প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের 'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র কর্মসূচী লক্ষ্য করা যায় চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, জনসংহতি সমিতি সদস্য ও সমর্থকদের হত্যা, অপহরণ, হামলা ও হুমকি প্রভৃতি নাশকতামূলক তৎপরতা। বস্তুতঃ প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের অস্ত্রের মুখে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলার কতিপয় এলাকার সাধারণ জুম্ম জনগণ আজ জিম্মি হয়ে পড়েছে। ফলে বিভিন্ন এলাকায় জনগণের পক্ষ থেকে তারা এখন প্রতিরোধের মুখোমুখী হচ্ছে এবং দিন দিন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। এটা দেখে এখন প্রসিত-সঞ্চয় চক্র মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা আগে থেকে অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ এর মতো তারা এখন জনসংহতি সমিতির সাথে সমঝোতার কথা বলছে। অথচ চুক্তির আগে থেকেই পার্টি যে সমঝোতার কথা বলে এসেছে সে ব্যাপারে তারা কখনোই ইতিবাচক ভূমিকা প্রদর্শন করেনি। এমনকি "বোমা ফেললেও তারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের শ্লোগান থেকে সরে আসবে না" বলেও ঘোষণা দিয়েছে।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ পার্টি তথা জুম্ম জনগণ কখনোই কামনা করে না। গৃহযুদ্ধের বিভীষিকাময় ও হৃদয় বিদারক তিক্ত অভিজ্ঞতা পার্টি তথা জুম্ম জনগণ অর্জন করে এসেছে। গৃহযুদ্ধ বা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের অধিকার অর্জিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে শত্রু পক্ষকে শক্তিশালী করে থাকে। তাই পার্টি প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সাথে চুক্তির পূর্ব থেকেই আলোচনা করে এসেছে জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে। বিভেদপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতা '৮৩ সালের ১০ নভেম্বরের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে আসলেও চুক্তির পরে পার্টি প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সাথে খাগড়াছড়িতে দু দু বার বৈঠকে বসেছে। ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে তাদের সাথে একটা সমঝোতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিভেদপন্থীদের সহজাত চরিত্র। চুক্তির কালি শুকাতে না শুকাতেই তারা ২১ ফেব্রুয়ারী সকাল বেলায় দাঁতকুপ্যায় সুখেন্দু বিকাশ চাকমা নামে পার্টির একজন সদস্যকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে থাকে। এই হত্যাকান্ড সেদিন পার্টি তথা জুম্ম জনগণ ১০ নভেম্বরের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছিল। তা সত্ত্বেও পার্টি দ্বিতীয় বার ২০০০ সালের অক্টোবরে প্রসিত চক্রের সাথে বৈঠকে বসেছিল। কিন্তু সেখানেও কোন অর্থবহ ফল বেরিয়ে আসেনি। পার্টি বরাবরই জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে। নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ও সংঘাতের মাধ্যমে কোন জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই জুম্ম জনগণকেও আগের ন্যায় সাহসের সহিত এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত-সংঘর্ষ অবসানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। আসুন, প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সৃষ্ট ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত অবসানে ভাইয়ের বুকে তাক করা তাদের সেই অস্ত্র সংবরণ করাতে চার কুচক্রীর প্রেতাত্মা প্রসিত-সঞ্চয় চক্রকে বাধ্য করি। বর্তমান মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের সকল প্রকারের ষড়যন্ত্রমুলক অপতৎপরতা বিনাশ করাই সকলের একমাত্র করণীয়। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হলে জুম্ম জনগণের অধিকতর অধিকার আদায়ের পথ সুগম করবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠবে।

তথ্য সহায়িকা ঃ

১। রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর, শ্রী পেলে, ১০ ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে, ১৯৮৪, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

২। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে গৃহযুদ্ধ ও তার ফলাফল, শ্রী পেলে, ১০ ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে, ১৯৮৫, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

৩। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের রূপরেখা, শ্রী জিমি, ১০ ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে, ১৯৮৫, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামী সম্প্রসারণবাদ, ১০ ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে, ১৯৮৫, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

৫। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী পলাশ খীসার অপ্রকাশিত নোট।

◆

বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনাদর্শ

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু হয়েছিল আজ থেকে দেড়যুগ আগে। তাঁকে কেউ ভূলেনি, ভূলতে পারেনি। যতই দিন যাচ্ছে ততই তিনি সকলের মনে জীবন্ত হয়ে উঠছেন। জুম্মদের সমগ্র সত্বা জুড়ে তিনি নূতনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবী এবং সেই সুবাদে সংগ্রামী। জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে আজীবন সংগ্রামী। তাই তিনি তাঁর জীবনের চেয়ে জুম্মদের অধিক ভালবাসতেন। তিনি নৃশংস, অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবার শেষ মুহূর্তেও উচ্চারণ করেছিলেন - 'জুম্ম জনগণ বেঁচে থাক'।

তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অধুনা কাপ্তাই বাঁধের জলে নিমজ্জিত মনোরম মা'প্রুম বা মহাপুরম গ্রামে। এই মা'প্রুম বা মহাপুরম গ্রামটি যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় ছিল, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিগণিত ছিল। যেখানে বিভিন্ন দিক হতে ছয়টি পথের মিলন ঘটেছে। এই মহাপুরম গ্রামেরই এক কৃতি সন্তান স্বর্গীয় চিত্তকিশোর চাকমা (লারমা) তাঁর 'চাকমা জাতির জীবন স্মৃতি' নামক গ্রন্থে সুললিত ভাষায় ও কৌশলী ব্যঞ্জনায় বর্ণনা করেছেন, ইহাতে মহাপুরম গ্রামের একটি জীবন চিত্র পাঠকের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। লেখকের বর্ণনায় উল্লেখ আছে -

> "পুরম নদীর তীরে শোভে স্বভাব সুন্দরে বাজে
> শোভিত রম্য মহাপুরম গ্রাম,
> সেই মোর জন্মভূমি, গরিয়সী মা জননী,
> জীবনের পরম-তীরথ ধাম।

মহাপুরম গ্রাম, মহাপুরম জনপদ। ছোট বড় চারিটি নদীর প্রবাহ পরিবেষ্টিত- নদনদী, গিরিবন, নিসর্গ সুন্দর, শোভিত শ্যামল বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই মহাপুরম জনপদ। ইহার দূর দুরান্ত পূর্বে কাজলং মোনের বন্দুক কুঁদা চুক, সুদুর পশ্চিমে ঘিলাছড়ি মোনের চৌধুরী চুক এবং দক্ষিণে আকাশের দিগন্ত কোলে মানিকছড়ি কোলের ফুড়াচুক মোন বিদ্যমান। শরৎকালে নদনদী গিরিবন ঘেরা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের নয়ন মনকে মোহিত করে, আমোদিত করে, নিসর্গের এই অলৌকিক রূপ সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণণা করা যায় না। অপরকে বুঝানো যায় না। ইহা স্বনয়নে দর্শন করা যায়। পরের চোখে দেখা যায় না। সংসার ভূলানো এই বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মোহনীয় দৃশ্য মন মানুষকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যায়, দৃষ্টিকে পথহারা করে। বিশ্ব জগত এতই সুন্দর।

এই সুবিস্তীর্ণ অববাহিকা অঞ্চলের প্রায় মধ্য ভূ-ভাগে মহাপুরম গ্রাম, মা'প্রুম নদীর সঙ্গম স্থলে এখনো বিদ্যমান থাকার কথা। কিন্তু কর্ণফুলী নদীর কাপ্তাই হ্রদের অতল তলে এই মহাপুরম গ্রামের অস্তিত্ব আজ চিরতরে হারাইয়া গিয়াছে।

বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমির মাঝে মহাপুরম গ্রামের অবস্থান এই গ্রামকে বৈশিষ্ঠ্যময় করিয়া রাখিয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে আগত ছয়টি পথের মিলনগ্রন্থি এই মহাপুরম গ্রাম। কিন্তু মহাপুরম শহর নহে, বন্দর নহে। তবে চাকমা রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সমকাল হইতেই রাজ্যের ভূপ্রকৃতিগত কারণে মহাপুরম বিভিন্ন দিকগামী পথের মিলনকেন্দ্র হইয়াছিল।" (সূত্র ঃ চাকমা জাতির জীবন স্মৃতি, ১ম সংস্করণ)

এই মনোরম প্রকৃতির লীলাভূমি এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কেন্দ্রভূমি মহাপুরম গ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম। তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় চিত্তকিশোর চাকমা মহাপুরম গ্রামের জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, একজন ধার্মিক ব্যক্তি ও সমাজসেবক ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি প্রব্রজ্যা জীবন অবলম্বন করে শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় মহাথেরো নামে অভিহিত হন। ভিক্ষু সংঘের মধ্যে তিনি শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও সাধক হিসেবে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি চাকমা রাজগুরু, ষষ্ঠসংগীতিকারক শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরোর সহিত সত্তরের দশকে কয়েক বছর রাঙামাটি রাজ বিহারে অবস্থান করেছিলেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পিতা চিত্তকিশোর চাকমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রয়াত কৃষ্ণ কিশোর চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ১৯১৯ সালে বিএ পাশ করে স্কুল পরিদর্শকের চাকুরী গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিটি পাশ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন - ফলশ্রুতিতে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীর আবির্ভাব ঘটে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার আলো বিস্তৃত হয়ে পড়ে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি একজন কিংবদন্তী পুরুষে পরিণত হন।

সেই সময় জুম্ম সমাজে অভিজাত শ্রেনী ও সাধারণ প্রজাশ্রেনী নামে দুটি শ্রেণী বিরাজমান ছিল। অভিজাত শ্রেণী সাধারণ প্রজাদের উপর শোষণ, নির্যাতন ও উৎপীড়ন ছাড়াও সাধারণ প্রজাগণকে হিংসা ও অবহেলা করত। কৃষ্ণ কিশোর চাকমা ও চিত্ত কিশোর চাকমা উভয়েই সমাজের এই শ্রেণী বিভেদ এবং অভিজাত শ্রেণীর শোষণ, নির্যাতন ও হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। অবশ্য তাদের পিতৃদেবও সমাজের এই বিরাজমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি মহাপুরমের ন্যায় একটি সুন্দর গ্রামে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। তিনি রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়েরও ছাত্র ছিলেন। তিনি শৈশব কাল হতে সৃজনশীল মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাজের মাধ্যমে দেখা যায় তিনি কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, কষ্ট সহিষ্ণু এবং অসীম মনোবলের অধিকারী। এইসব মহাগুণাবলীই তাঁকে ভাবী জীবনে জুম্ম জাতির মহান নেতৃত্বের আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছিল।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর জীবনাদর্শ এবং রাজনৈতিক ভাবধারা পারিবারিক ঐতিহ্য থেকেই অর্জন করেছিলেন। পূর্বেই বলেছি - সমাজে শ্রেণী বৈষম্য যে বিষাদময় ছিল, অভিজাত শ্রেণীর হিংসা, শোষণ, নিপীড়ন সাধারণ প্রজাগণকে অপমানিত ও নিষ্পেষিত করেছিল। এই সময়ের বিরুদ্ধেই ছিলেন তাঁর পিতা এবং জেঠা মহাশয় আজীবন সংগ্রামী। এই প্রেক্ষাপটেই বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনাদর্শ এবং রাজনৈতিক ভাবধারা জন্মলাভ করে। স্বীয় সমাজের সাধারণ মর্মবেদনার কথা অনুভব করতে পেরেছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে অন্ধকারের কালো অধ্যায় সূচনা করে দিল। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদকে অমান্য করে ৯৭.৫০% শতাংশ আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত করা হলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ইহা মেনে নেয়নি, মেনে নিতে পারেনি। কয়েকজন বিশিষ্ট পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ এই অন্তর্ভূক্তির তীব্র বিরোধিতা করে ভারত ও বার্মায় (মিয়ানমার) চলে যান। এই ঘটনার ভিত্তিতে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার ও জনগণ সমগ্র জুম্ম জনগণকে পাকিস্তান বিরোধী মনে করে এবং জুম্ম জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। অধিকন্তু জুম্মদিগকে অবাঞ্ছিত মনে করে এবং এদেশ থেকে বিতাড়িত করার অভিসন্ধি করতে থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেশে শিল্পোন্নয়নের ধূয়া তুলে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাইতে বাঁধ নির্মাণ করে ৫৫০০০ একর প্রথম শ্রেণীর চাষী জমিসহ ৪০০ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন করে ফেলা হয়।

ইহাতে এক লক্ষেরও অধিক অধিবাসী বাস্তুহারা হয়ে দারুণ দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হয়। তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা হয়নি। অপরপক্ষে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন না পেয়ে এবং বিভিন্ন হয়রানি ভোগ করে আত্মরক্ষার জন্য প্রায় ষাট হাজার লোক যাদের অধিকাংশই চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও মারমা ভারত ও বার্মায় (মিয়ানমার) দেশান্তরিত হতে বাধ্য হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন নেতা এই কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা আন্দোলন করেছিলেন বলে জানা নেই। অথচ বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তখন ছাত্রাবস্থাতেই কাপ্তাই বাঁধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর বিরুদ্ধে প্রচার পত্র বিলি করার সময় ১৯৬২ সালে তিনি চট্টগ্রামে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এই আজীবন সংগ্রামী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভাষাভাষি এগারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে অভিন্ন জুম্ম জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠনের মাধ্যমে অভিন্ন জুম্ম জাতীয়তাবোধকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনাদর্শ যেমন ছিল আত্মনির্মাণধর্মী তেমন উদার। দেশ ও বিশ্বের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর জীবনাদর্শ ধীরে ধীরে মহীয়ান হয়ে এক সংগ্রামী চেতনায় গড়ে উঠেছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীদের ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে প্রবল উত্থান ঘটে তার ডামাডোলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে গিয়ে জুম্ম জনগণকে স্বাধীকার অর্জনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ১৯৭০ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল আসনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে প্রাদেশিক নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন বর্তমান বোমাং রাজা অংশোয়ে প্রু চৌধুরী।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর অঞ্চল থেকে তিনি সম্মানিত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা রাঙামাটি জেলার ৯৮নং কচুখালী মৌজার হেডম্যান স্বনামধন্য রোয়াজা পরিবারের সন্তান শ্রী চাথোয়াই রোয়াজাকে রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ আসনে ১৯৭৩ সালে শ্রী চাথোয়াই রোয়াজা নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির ব্যানারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়যুক্ত হন। রোয়াজা পরিবার সেই সময় হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অঙ্গনে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করে এসেছেন।

বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংস্পর্শে যারা এসেছেন তারা কোন না কোন বিষয়ে উপকৃত ছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ হননি। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তংঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, লুসাই, পাংখোয়া, খুমী, বম, খিয়াং , চাক প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর কোন না কোন ব্যক্তিকে তিনি সহায়তা দান করে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর এই মহৎ ও উদার গুণের যেমন ছিল গভীরতা তেমনি ছিল ব্যাপকতা।

১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গণপরিষদ অধিবেশনে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান উথাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের কোন কথাই উল্লেখ নেই। পাহাড়দের কোন স্বীকৃতি নেই। বরং বলা আছে - বাংলাদেশে যারা বসবাস করে তারা সবাই বাঙালী নামে পরিচিত হবে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম পাহাড়ীরাও বাংলাদেশের নাগরিক এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ ছিল।

আজীবন প্রতিবাদী ও সংগ্রামী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মহান সংসদে এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন - "একজন বাঙালী কোনদিন চাকমা হতে পারে না, অনুরূপ একজন চাকমাও কোনদিন বাঙালী হতে পারে না।" তিনি মহান সংসদে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের কথা উথাপন করেননি, তিনি বাংলাদেশের মেহনতী মানুষের, কৃষক-শ্রমিকের, মাঝি-মাল্লার, তাঁতী-জেলের, কামার-কুমারের কথাও উথাপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আজকে নারী পুরুষের সমানাধিকারের যে দাবীর কথা বাংলাদেশে উঠেছে সেই নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথাও মহৎ প্রাণ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মহান সংসদে উথাপন করেছিলেন।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সকলের মর্যাদাপূর্ণ জীবন বিনির্মাণে ব্রতী ছিলেন। তিনি অধিকার বঞ্চিত, চির অবহেলিত জুম্ম জনগণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী মহান সংসদে উথাপন করেছিলেন। এদিকে সেই দাবী আদায়ের লক্ষ্যে, স্বাধীকার আদায়ের সংগ্রামে জুম্মদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর সকলেই একই ও সমান। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল জুম্ম জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণে সংগ্রামী। তাঁর একটি চিঠির ভাষা হতে আমরা বুঝতে পারি তিনি অহিংস ছিলেন। তাঁর ভাষায়- "আমরা terrorist নই, আমরা আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ অর্থাৎ জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামী। আমরা কারোর terrorist হবো না, হতেও চাই না।" (সূত্র ঃ প্রবাহ, ঢাকা, ১৩ নভেম্বর ১৯৯৭)। বিপ্লবী, সংগ্রামী হলেও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন অহিংসার পূজারী। তাঁর কথাবার্তা মৃদু, কণ্ঠস্বর গভীর, ভদ্র ও নম্র, সদালাপী, আচার ব্যবহার অমায়িক। তিনি খুবই সাধাসিধে জীবনযাপন করতেন। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল প্রকৃত মহাপুরুষের জীবনাদর্শ তা বললে অত্যুক্তি হবে না।

◆

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ ঃ যুব সমাজ

তনয় দেওয়ান

সমাজে সবারই ভূমিকা স্বীকার করতে হবে। শ্রেণীগত স্বার্থ বিবেচনায় রেখে সবাই কম বেশী সমাজের জন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তবুও যুব সমাজের আলাদা গুরুদায়িত্বের কথা বিবেচনা করতে হয়েছে যুগ যুগে। যুব সমাজের গতি-প্রকৃতি সমাজকে হয় অগ্রগতি নতুবা পশ্চাতে ঠেলে দিয়েছে - ইতিহাসে তার নজির সর্বত্র। তাই যুব সমাজকে সঠিক ও যথাযথ পথে পরিচালিত করার প্রয়োজনীয়তাও এর সাথে জড়িত। গত ক'মাস ধরে থানা পর্যায়ে যুব সমাবেশ ও যুব শাখা গঠন করে আমাদের পার্টি এই সত্যকে আরো দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজকে আরো সুসংগঠিত করেছে।

কিন্তু আমরা যদি এই মুহূর্তে আমাদের সমাজের চারাপাশে তাকাই তবে কি দেখতে পাই? দেখতে পাই - যুবসমাজের মধ্যে একটা অংশে ভ্রাতৃঘাতী নীতি ও লক্ষ্যহীন লড়াই, প্রতিক্রিয়াশীল ও দালালদের আস্ফালন এবং বাড়াবাড়ি আর সমাজ জীবনের সর্বত্র আর্থিক দৈন্যতা আর নৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খা ও উচ্চাভিলাষ এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা। এবং অন্যদিকে সমাজের ভালো দিকের দিকে যদি মনোনিবেশ করি তাহলে দেখবো যে, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা আগের চাইতে আরো সুশৃঙ্খল আর আমাদের পার্টির প্রতি আনুগত্যমুখী হয়েছে। সমাজের মেরুকরণে উঠতি টাকা পয়সাওয়ালা আর শিক্ষিত মহল আন্দোলনে নিজেদের ভূমিকাকে পুনঃমূল্যায়ণের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করতে সমর্থ হচ্ছে।

আদর্শবান ও সক্রিয় যুব সমাজ যে কোন সমাজের চালিকাশক্তি। আমাদের যুব সমাজের একটা শক্তিশালী অংশ হলো ছাত্ররা। কিন্তু আমাদের সমাজের ছাত্রদের একটা অংশে নৈতিকতা আর সংগ্রামী মানসিকতার মানদন্ডও হ্রাস পেয়েছে উদ্বেগজনকহারে। রাজনৈতিক দলাদলি, মাদক আর নেশাগ্রস্থতা, নৈতিক চরিত্রের পরিহানি প্রভৃতি রোগ তাদেরকে সরীসৃপের মতো ঘিরে ধরেছে। নেতৃত্ব যদি প্রগতিশীল আর সুদক্ষ না হয় এবং সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তবে এধরনের ক্ষয় রোগ আর বিকাশহীনতা ঘিরে ধরে। যার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করছে বর্তমানের জুম্ম সমাজ।

ইতিহাসের দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই যে, ত্রিশ দশকের শেষের দিকে প্রথম জুম্ম ছাত্র সমাজের বিপ্লবী চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে। যার প্রতিফলন ঘটেছিল '৪৭ এ ভারত বিভাগের সময়ে। সমাজের নেতৃত্ব মহলে তখন ভাবতে বাধ্য হয়েছিল সমাজটা কোন দিকে যাচ্ছে? এসময়ে ছাত্র যুবসমাজ সশস্ত্র সংগ্রামের চিন্তাও করেছিল। পরে ষাটের দশকের প্রথমার্ধ থেকে যে ছাত্র আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে তা বাংলাদেশের শাসনামলে যথাযথভাবে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয় বলে প্রায় তিন যুগের অধিককাল ধরে গণতান্ত্রিক ও সশস্ত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সমতা ধরে রাখতে পেরেছিল। তাদেরই প্রচেষ্টায় সমাজের অগ্রগতি আর বিকাশের স্বার্থে নতুনভাবে ছাত্র সমাজের জাগরণ প্রচেষ্টা আশির দশকের শেষ সময়ে শুরু হয়। সমাজের শুণ্য স্থান পূরণ করার একটা উজ্জ্বল ক্ষেত্রও রচিত হয়েছিল সেসময়ে। কিন্তু সেটা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বিভেদের চোরাবালিতে পতিত হয়। কারা এজন্য দায়ী সেটার কথা আমাদের সমাজ বাস্তবতার আলোকে জানতে হবে, বুঝতে হবে সবাইকে।

এই দিনগুলোতে ভালো নেই কেউই। অভিভাবক আর বয়স্করাও এই টেনশন থেকে মুক্ত নন। আর্থিক শোচনীয়তা বা দুরাবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা তাদেরকে পশ্চাতে ঠেলে দিচ্ছে। সমাজ তথা জাতীয় জীবনে অশান্তি আর নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে সর্বত্র। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা সবার কাছে উদ্বেগের বিষয়। উন্নয়ন নামক সোনার হরিণ পাবার আকাঙ্খা আর তেমন কাউকে নাড়া দেয় না। বরং উন্নয়নের নামে আবার কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেটাই বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। কারণ উন্নয়নের ভয়াবহ রূপটা এখানকার মানুষ দেখেছে বড়ো বেশী হারানোর বাস্তবতা থেকে। এখানে উন্নয়নের নামেই কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করতে গিয়ে জুম্মরা আজন্ম লালিত পালিত মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে চিরতরে। এখনো উন্নয়ন মানে ভূমি বেদখল নাটকের নতুন মহড়া। লড়াইটা যেখানে ভূমির জন্য সেখানে উন্নয়নের করালগ্রাস তাই বড়ই ভয়াবহ।

আত্মমর্যাদা আর পিতৃ-মাতৃ প্রদত্ত জীবনটা কিভাবে নিরাপদ থাকবে সেটাও ভাবতে হচ্ছে যত্রতত্র। এমন অনিশ্চয়তা আর দুর্দিন আগেও রচিত হয়েছিল। তখন জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে নক্ষত্রের মতো উদয় ঘটেছিল এম এন লারমার। তার চারদিকে সমবেত হয়েছিল নিপীড়িত আর ভাগ্য বিতাড়িত জুম্ম জনতা। গড়ে উঠেছিল ৫ দফার ভিত্তিতে জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জুম্ম জাতীয়তাবাদকে প্রগতিশীল আদর্শের নেতৃত্বে পরিচালিত করে গৌরবোজ্জ্বল সশস্ত্র সংগ্রাম। কিন্তু সেই মহানায়কের অন্তর্ধান হয়েছিল চরম বিপর্যয় আর অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে দিয়ে সমগ্র জাতিকে। যারা এই পরিণতি ঘটিয়েছিল তারা সমাজে আজ লালিত পালিত, প্রতিষ্ঠিত। তাইতো জাতির ভাগ্যের সাথে 'বেঈমানী' নামক শব্দটার বিলোপ হতে পারছে না। বরং যে কোন ফাঁক ফোকড় পেলে মহানায়কের মুখোশ পড়ে উদ্ভাসিত হতে চায়। এভাবে বর্তমানে নতুন ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের আত্মপ্রকাশ।

প্রশ্ন জাগে কেন এই ভাগ্য বিড়ম্বনা? কেন এই অনৈক্য আর ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের দামামা? উত্তরে একটাই প্রধান উপজীব্য বিষয় - আর সেটা হলো জুম্ম জাতির আভ্যন্তরীন অবস্থাই হলো এর জন্য দায়ী। জুম্ম সমাজই এর লালন পালন কর্তা। সমাজের শ্রেণী বৈশিষ্ট্যই এই সকল কাজের আধার। তাহলে কি সেই আভ্যন্তরীন আবস্থা? অর্থাৎ সমাজটা কতটুকু প্রতিক্রিয়াশীল দোষে দুষ্ট? এই দিকগুলো নিয়ে ভাবার সময় এসেছে নতুন করে।

ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিসমূহের মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আঞ্চলিক প্রবণতা, সামন্তীয় চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও দালালীপনা, অর্থমুখী ও আদর্শহীন সুবিধাবাদী রাজনৈতিক জোট, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, গ্রাম্য রাজনীতি ও ক্ষমতার মোহ, পরশ্রীকাতরতা ও শ্রমবিমুখতা প্রভৃতির কারণে জুম্ম

সমাজেসুবিধাবাদী মধ্যপন্থীদের রাজত্ব চলছে। এই অন্ধকারময় রাজনৈতিক রোগগুলো সমাজদেহে রয়েছে বলেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রংএ আমাদের জাতীয় জীবনে বিভেদ আর ষড়যন্ত্র শক্ত ভিত রচনা করেছে যুগে যুগে।

দশ ভিন্ন ভাষা ভাষী মানুষের ঐক্য কিভাবে সম্ভব? ভাষাগত ঐক্য, নাকি জাতিগত ঐক্য, নাকি চিন্তাধারাগত ঐক্য? সম্ভব চিন্তাধারার ঐক্য। আর চিন্তাধারাটি হলো জুম্ম জাতীয়তাবাদ। যেখানে একজন চাকমা বা মারমা বা ত্রিপুরা নিজেকে জুম্ম হিসেবে ভাবতে পারবে সেখানে হবে জুম্ম জাতীয়তাবাদের গোড়াপত্তন। আমরা সেটা করতে অনেক সফল হয়েছি। উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী স্রোতের বিরুদ্ধে আমরা নিজেদেরকে বাঙালীত্বের মোড়কে ঢেকে ফেলিনি। শাসকগোষ্ঠীর ভয়টা ছিল সেখানেই। তাই তার দরকার পড়লো আমাদের ভিতরে ঢুকে আমাদের নিজেদের মধ্যে সুড়সুড়ি দেবার। আর তারই সস্তা ফসল হলো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। আমরা আর নিজেরা সবাই মিলে জুম্ম থাকতে পারলাম না। আমাদের শোষণের বিরুদ্ধে, নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জুম্ম জাতীয়তাবাদ নামক নিরাপদ দেয়াল ভেঙে ফেলে আমরা স্ব স্ব জাতির ব্যানার উর্ধ্বে তুলে ধরতে সোচ্চার হলাম। তারই পরিণতি হিসেবে গড়ে উঠলো কয়েকটি জাতিভিত্তিক সংগঠন। সস্তা শ্লোগান হলো নিজেদের জাতির উন্নতি। কিন্ত শ্রেণীগত বিশ্লেষণে তারাই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো সমাজে এতদিন যারা সামন্ত সমাজের দন্ডমুন্ডকে নিজেদের হাতে রেখেছিল। সাধারণ ত্রিপুরা কিংবা মারমা কিংবা মুরং'রা কিংবা অন্য কোন জুম্ম জাতি এতে লাভবান হলো না কোনমতেই। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ তাই জুম্ম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে একটি আত্মঘাতী ভাইরাসে পরিণত হলো। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনপন্থী আর শাসক মহলরা এখনো এই ভাইরাসটিকে ছড়িয়ে চলেছে তাদের সামর্থ্য অনুসারে। উপনিবেশিক 'ভাগ করো শাসন করো' নীতিটি এখানেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। তাই এর দেয়াল আর সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসতেও প্রয়োজন সচেতন ও আদর্শবান যুব সমাজের নেতৃত্ব।

তারপরও দেখা যায় যে, মুল আন্দোলনের সাথে যুক্ত না হলেও অনেকে রাজনীতিতে সচেতন হিসেবে দাবী করে। ধরে নিলাম আমরা যে, তারা সচেতন এবং বুদ্ধিজীবি নামক সম্মানের অধিকারী। কিন্ত তারা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ? আমরা জানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের চাইতে অনেক অনেক বেশী শক্তিশালী। তাহলে এই সকল সচেতন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পন্ন ব্যক্তিরা ঐক্যবদ্ধ না হলে কিভাবে জয়ী হবেন (যদি তাদের জয়ী হবার বাসনা থাকে)? আসলে তাদেরও একটা রোগ রয়েছে আর সেটা হলো মূল স্রোতের আন্দোলনের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারা। আর এর পেছনের কারণ হলো স্বার্থ ত্যাগ করতে না পারা। যেহেতু তারা উপদেশ নামক জিনিসটি ড্রয়িংরুমে বসে ঝাড়তে পছন্দ করেন। তাদের এই ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিরুচি আর সময়ভেদে সার্কেলগত ঐক্যও জুম্ম সমাজের অনৈক্য আর বিভ্রান্তির জাল ছিটাতে বহুল পরিমাণে ভূমিকা রেখে চলেছে।

কেউ কেউ আবার ড্রয়িং রুমে বসে রাজনৈতিক উপদেশ দেওয়া থেকে বেরিয়ে এসে 'রাজনীতি' নামক মহান পেশার সাথেও যুক্ত হন। তবে তাদের এর সাথে থাকে না ত্যাগ আর সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্খা। তাদের লক্ষ্য থাকে নিজেদের স্বার্থ আরো সুসংহত ও স্ফীত করা। অন্যদিকে শাসকমহলের প্রয়োজন এরকম ব্যক্তিত্বের কিংবা গোষ্ঠীর। যারা গাছেরটাও খাবে আর তলারটাও খাবে। তারাই হলো সবচেয়ে নিন্দিত কীট- দালাল। এরা শাসক মহলের রাজনৈতিক লেবাস গায়ে জড়িয়ে কখনো কখনো জনপ্রতিনিধি হয়ে জাতীয় স্বার্থকে ধুলোয় মিশিয়ে নিজের বাহাদুরী দেখায়। সত্যি এরাই আহাম্মক। এরাই জীবনে সবচেয়ে সুখী ভেবে নিজের সাথে সাথে সমাজের বারোটা বাজাতে সদাব্যস্ত তৎপর থাকে। তাদের বদৌলতে শাসক মহল রামকে শ্যাম আর যদুকে মধু বলে দিব্যি চালিয়ে যায়। এই সকল কীটগুলো যেমনি আদর্শহীন তেমনি আর্থিক স্বার্থই তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের মূল লক্ষ্য। এরা হলো গ্রামীণ রাজনীতির বাছাই করা ও শহরে সমবেত অংশ।

অন্যদিকে সমাজের সিংহভাগ মানুষের বাস গ্রামে। গ্রামে বসেও চালবাজী করার লোকের কোনো অভাব নেই। পূর্বকে পশ্চিম আর ডানকে বাম করতে তারাও সিদ্ধহস্ত। হাজার হোক তারাও সামন্ত সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ধারক বাহক। তাদের গ্রামীণ রাজনীতির কুটকৌশল মেকিয়াভেলীর কৌশলকেও হার মানায়। এরা বর্তমানে গ্রামীণ সমাজে বিভেদমুলক তৎপরতা আর ভ্রাতৃঘাতী কার্যকলাপে সমর্থন আর পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মাথার উপর হাড়ি ভাঙছে।

'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হবার প্রবাদটি আমরা কমবেশী সবাই শুনেছি। রাজনীতিতেও এর কদর রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। তারাই এটা হতে চায় যারা শ্রমবিমুখ অথচ পরশ্রীকাতরতায় সহ্য করতে পারে না চারপাশ। তাদের শ্রমবিমুখতা আর পরশ্রীকাতরতার ফল হলো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। তারা গ্রামীণ রাজনীতির চারপাশ বুঝে আর দালালদের চালবাজীও বুঝে। তাই শাসক মহলের সাথে কিভাবে দফারফা করতে হয় আর গ্রামের সহজ সরল জনতাকে কিভাবে বিভ্রান্ত করতে হয় তা ভালোই জানে। এরা শিক্ষিত আর রাজনীতির মিছিল মিটিং এর গলাবাজী সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে তারও মহড়া চলছে সক্রিয়ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপদে।

তাই এই ক্ষয়িষ্ণু সামন্তীয় সমাজের মধ্যে অবস্থান করে আমরা যুব সমাজের বিন্যাসকে কিভাবে দেখতে পারি? সাধারণভাবে যুব সমাজকে সংগ্রামী ও প্রতিবাদী হিসেবে ধরে নিতে হবে। ছাত্ররাও যুব সমাজের অংশ। বলা যায় অগ্রণী অংশ। বয়সে তরতাজা, সংসার ধর্ম সম্পর্কে নির্লোভতা, প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যবদ্ধতা তাদেরকে সবসময়ই অগ্রণী করে রেখেছে। তাই আজকালকার দিনে যুব সমাজের কাজটি কেবল ছাত্ররা করে বলে যুব সমাজের ভূমিকাটি আমরা সঠিকভাবে দেখতে পাই না।

আমাদের শহরাঞ্চলে শিক্ষিত যুব সমাজের সমাবেশ বেশ লক্ষ্যণীয়। তাদের অনেকগুলো ভালো দিক থাকলেও তাদের মধ্যে অধিকাংশই কেবলমাত্র চাকুরী করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা নামক সমাজের মানদন্ডটির পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্ত তাদের দোষের কিছুই নেই। কেননা একজন যুবকের আত্মমর্যাদা সমাজের দৃষ্টিতে চাকুরীর প্রাপ্যতার সাথেই জড়িত।

সবার বেলায় তো আর চাকুরী সংস্থান করা যায় না। অনেককে বেকারত্বের থাবায় ঝরে পড়ে যেতে হয়। তখন তাদের সাথী হয় চরম হতাশা আর জীবন সম্পর্কে হীনমন্যতা। তাদের প্রাণ শক্তি তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। বিনোদন, সম্মান, ভালবাসা সবকিছুই যখন সমাজের বাজারে টাকার অংকে বেচাকেনা হতে দেখা যায় তখন তারাও আর সৎ থাকতে পারে না। অসততা আর শহরের মন্দ সংস্কৃতি তাদের অস্তিত্বে বিচরণ করতে শুরু করে। এভাবে আমাদের যুব সমাজের একটা বিশাল অংশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখী। মধ্যবিত্ত নামক শহুরে পরিবেশে

বড়ো হয়ে তারা আজ না পারছে নিচে নামতে, না পারছে উপরে উঠতে। কারণ নিচে নামতে কেউ চায় না আবার উপরে উঠার যোগ্যতাও সহজে লাভ করা যায় না।

গ্রামাঞ্চলের দু'ধরনের যুব সমাজের সাধারণ উপস্থিতি রয়েছে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত। গ্রামীণ জীবনে বসবাস করে বর্তমান কালে জীবন ধারণ করা কতো যে কষ্টকর সেটা গ্রামে গেলেই বোঝা যায়। সীমাহীন বেকারত্ব বা কর্মহীনতার সরীসৃপ তাদেরকে ঘিরে রেখেছে; পঙ্গু হয়ে গেছে গ্রামীণ অর্থনীতি। দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়ন আর সহিংস পরিবেশের ফলে তাদের আয় উপার্জন আর সংস্থান সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। মাঠে কাজ করার জমি নেই, পাহাড়ে চাষ করার পাহাড় নেই, টুকটাক ব্যবসা করার পয়সা পকেটে নেই। শুধু নেই আর নেই এর হাহাকার ধ্বনি গ্রামের চারদিককে মলিন আর বেদনাভরা করে তুলেছে। যা কিছু পুঁজি ছিলো তাও জড়ো হয়েছে উঠতি শহরের অর্থনীতিতে। ফলে গ্রামের যুব সমাজের মেরুদন্ডও আগের মতো সোজা নয়। আর তাই এমুহূর্তে সবচেয়ে বেশী জরুরী শহর ও গ্রামীণ যুব সমাজের এক মহামিছিল রচনা করা। যদিও আমাদের পার্টিতে যুব সমাজের অংশগ্রহণই সব সময় বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

এই অবস্থায় জুম্ম জনগণ আর ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত-সংঘর্ষ চায় না। প্রথম দিকে কোনো কোনো যুবকের মনে নতুন করে সশস্ত্র জীবনের হাতছানি ডাক দিয়ে যেত। ফলে চুক্তিকে গ্রহণ না করে নতুন করে সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন তাদের দৃষ্টিকে বিভোর করে দেয়। তাদেরও আজ স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। স্বপ্ন দেখতে গিয়ে যে বাস্তবতা সম্মুখে হাজির হলো তার পরিণতি ছিল নিছক ছেলেমানুষী রাজনৈতিক খেলা আর ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে নিজেদের শক্তি ও জনবল ক্ষয় করা। সাধারণের মাঝেও ছিলো পাওয়া আর হারানোর দোলাচাল। তারাও একুল রাখি নাকি ওকুল রাখি এই অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত। এ সুযোগে জনসংহতি সমিতির ভুলভ্রান্তি আর সমিতির কর্মীদের ব্যক্তিগত দোষত্রুটিকে ভর দিয়ে কিছু কিছু গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র তৎপরতা। ইউপিডিএফ-এর নেতাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আর গ্রামীণ হীনরাজনীতি মিলে যে ককটেল সৃষ্টি হলো তাতে সাধারণ জনগণের জান যায় যায় অবস্থা। কিন্তু কোন কিছুই সীমাহীনভাবে কিংবা লাগামহীনভাবে চলতে পারে না। সমাজের প্রগতিশীল শক্তি আর চিন্তার স্ফুরণ ঠিকই ঘটে। তাই জনগণ এখন চায় যে, যে কোন একটা পক্ষ দৃঢ়ভাবে জয়যুক্ত হোক। আর এক্ষেত্রে চুক্তিকে যারা গ্রহণ করতে পারেনি তারা যেহেতু নতুন স্বপ্নও বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে হোচট খেয়েছে তাই তাদের প্রতি জনগণের আস্থা স্বাভাবিকভাবে থাকবে না তা তারা বুঝতে পেরেছে। এতে তাদের অবস্থাও দৃঢ় না হয়ে নড়বড়ে হবে তা অনায়াসে বলা যায়। ফলে গতিপথ পরিবর্তন করতে তারাও বাধ্য হবে। গতিপথ পরিবর্তনের সাম্প্রতিক মহড়া হলো ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ। কপালে যা জুটলো তা হলো কল্পরঞ্জন, দীপংকরের মতো দালালদের চেয়েও কম ভোট। ভোটের রাজনীতিতে এম এন লারমার মতো করে উদয় হবার আকাঙ্খা কেউ যদি করে তবে সেটা তার উচ্চাভিলাষের সামিল। এই উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রসিত-সঞ্চয় সন্ত্রাসী তথা ইউপিডিএফ বিদেশী অপহরণ করে যে টাকা কামাই করেছিল তার কিছু অংশ ব্যয় করে। শুধু তাই নয়, নিজেদের অর্জিত চাঁদাবাজি আর অপহরণের টাকাগুলোর ভাগ বাটোয়ারার সমীকরণ না মেলায় অনেকে হতাশ হয়েও পড়েছে। রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিয়ে অনেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু, চাকুরী খোঁজা আর নিরুদ্রপে থাকার পথ বেছে নিচ্ছে।

জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে দুর্যোগ সবসময় কমবেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে তা থেকে উত্তরণের জন্য চিরন্তন চিন্তাও এম এন লারমা দিয়ে গেছেন। তাই এম এন লারমার অনেকগুলো চিন্তাধারার মধ্যে একটি হলো জাতীয় জীবনের দুর্যোগের সময়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রচেষ্টা। যার জন্য তিনি 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতি'র মাধ্যমে চরম ক্ষমা গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তিনি শুধু তত্ত্বের অবতারণা করেননি বাস্তবে তা রূপায়ণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন দৃঢ়ভাবে। শেষ পর্যন্ত নিজের বুকের তাজা রক্ত দিয়েও তিনি তা অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন। তার এই নীতির অবলম্বন করে জনসংহতি সমিতির শান্তি চুক্তিস্তোর সময়ে আটাশ জন সদস্য চুক্তি বিরোধীদের হাতে নিহত হলেও ক্ষমা করার মতো সৎ সাহস নিয়ে এগিয়ে চলার রাজনৈতিক আদর্শ ও শক্তি রয়েছে। কিন্তু সীমাহীনভাবে এই ক্ষমা করার নীতির প্রয়োগ থাকতে পারে না। '৮৩ সালের ১০ নভেম্বরের পর হতে যেমনি বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা করা জনগণ সমর্থন করেনি তেমনিভাবে এখনও জনগণ আর ক্ষমা করার পক্ষে নয়। তাইতো জনগণ বারবার বলছে যখন জনসংহতি সমিতি জঙ্গলে ছিল তখন আমরা নিজেদের মধ্যে শান্তিতে ছিলাম। কিন্তু আজ ইউপিডিএফ জঙ্গলে ঢুকে নিজেকে জংলী করে ফেলেছে। তারা মনুষ্যত্ব আর দেশপ্রেম হারিয়ে ফেলেছে।

এখন এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের একটা প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে আমরা কি বিভেদ আর ভ্রাতৃঘাতী সহিংসতায় মেতে থেকে নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবো নাকি সাহস আর ঝুঁকি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে সম্মুখে এগিয়ে নেবো?

মনে রাখতে হবে যে যাই করি না কেন ইসলামী সম্প্রসারণবাদী ও উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের করালগ্রাস হতে মুক্ত হতে হলে নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ অবসান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেটার জন্য যতই হারাতে হোক না কেন। এবারের নির্বাচনে দালাল আর প্রতিক্রিয়াশীলদের একটা অংশ তীব্র মনোবেদনা আর জ্বালা নিয়ে শিক্ষা পেয়েছে জুম্ম জনগণের কাছ থেকে। তবে তাদের এখনো ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে। হয়তো নতুন মাত্রাও যোগ হতে পারে এরপর থেকে। কেননা শত্রুর রূপও পরিবর্তন হবে নিকট ভবিষ্যতে। নির্বাচনোত্তর সময়ে এনজিওগুলো আবার নতুন পসরা খুলে বসতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে থাকিয়ে আছে। অপহরণ নাটকের মহড়ায় সরকারের অভিনয় ফ্লপ করার পর দাতা সংস্থাগুলোও নতুন করে নড়েচড়ে উঠতে আরম্ভ করবে নতুন সরকারের আমলে। এখানে এটা মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা হলো মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র।

আজকের দিনগুলোতে তাই এম এন লারমার প্রদর্শিত আদর্শ আর চেতনায় শাণিত হওয়া ছাড়া আমাদের দুর্ভোগ আর অনৈক্য মীমাংসা করার কোন পথ খোলা নেই। ভূমি কেন্দ্রিক লড়াই এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের লড়াইয়েও আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে শামিল হতে হবে। আসুন মহান নেতার প্রদর্শিত সেই পথ ধরে হেঁটে যেতে যেতে জনতার মিছিল রচনা করি। আর এই মিছিলের অগ্রভাগে থাকতে হবে আদর্শবান ও সক্রিয় যুব সমাজের সার্বক্ষণিক অবস্থান।

◆

নির্বাচন রঙ্গ

সুদীর্ঘ চাকমা

১.

গত ১লা অক্টোবর, ২০০১ ইংরেজী শতাব্দীর প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। নব্বই দশকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, "আমেরিকায় সাধারণ নির্বাচনে ৫০ শতাংশ মানুষ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে যায়, ক্লাবে, হোটেলে সময় কাটায়। বাকী ৫০ শতাংশের মধ্যে ২৫ শতাংশ ভোট পেয়ে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্য পদে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে কিউবায় ৯৮ শতাংশ মানুষ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে নির্বাচনে জয়ী হতে হয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে কিউবা পরিচালিত হয়; আমেরিকায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং সে সরকার দেশ পরিচালনা করে। তাহলে কোন দেশে গণতন্ত্র বেশী?" বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন প্রহসন মাত্র। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেখা গেছে - যারা ঋণখেলাপী, কালো টাকার মালিক, বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী তারাও নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের "ধানের শীষ" ও "নৌকা" মার্কা নিয়ে। নির্বাচন কমিশন এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে গরীব মানুষের পক্ষে যোগ্য, সৎ প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে জয়ী হতে না পারে। বিষয়টা এমন যে, গরীবেরা ভোট দিতে পারবে কিন্তু প্রার্থী হয়ে জয়ী হতে পারবে না। প্রার্থীর জামানত পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকা করা হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয় তিন লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সামরিক, বেসামরিক আমলারা অবসর গ্রহণের সাথে সাথেই দুর্নীতির পয়সায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। ফলে দলের অনেক ত্যাগী ও যোগ্য নেতা তারা কালো টাকার মালিক ও ঋণখেলাপীদের সাথে মনোনয়নের দৌড়ে পরাজিত হন। দলীয় মনোনয়ন পেতেও চলে আর্থিক লেনদেন, যোগ্যতার চাইতে প্রার্থীর ব্যাংক ব্যালেন্সের প্রতি অধিক নজর থাকে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর।

দেশ স্বাধীনের ৩০ বছর আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পালাবদলে অধিষ্ঠিত হয়েছে, ক্ষমতা শেয়ার করেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কায়দায় তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে; নির্বাচন হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ১৯৬৯ সালে দেশে ভূমিহীন ছিল ৩০ শতাংশ; বর্তমানে ৭০ শতাংশ ভূমিহীন। '৭১ সালে একজন শ্রমিক তার মাসিক বেতন দিয়ে পাঁচ মণ চাল ক্রয় করতে পারতো; বর্তমানে শ্রমিকেরা যে বেতন পায় তা দিয়ে দুই মণ চাল ক্রয় করতে পারে না। বর্তমানে দেশে দুই কোটি মানুষ ছিন্নমূল, ৭০০ লোক প্রতিদিন গড়ে অপুষ্টিতে মারা যায় যারা অধিকাংশ শিশু; সাড়ে ৩ কোটি বেকার; ৫০ হাজার গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই; ৫৪ ভাগ মানুষের ডাক্তার দেখাবার আর্থিক সামর্থ্য নেই। কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ফসল ফলায় তার ন্যায্য দাম পায় না; প্রতিদিন গড়ে খুন হয় ১০/১২ জন। বিগত ৩০ বছরে পাঁচ লক্ষাধিক নারী-শিশু বিদেশে পাচার হয়েছে; ২০ লক্ষ একর জমি শাসক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের দখলে; ৬৩ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। তারপরও এদেশের গরীব মানুষ নির্বাচন এলে নানা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে ধানের শীষ, নৌকা, লাংগল, দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি নিয়ে নাচানাচি করে।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে দেখা দেয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের কৌতুহল, উৎসাহ। যেন এদেশের জন্য তারা জীবনটাই দিতে প্রস্তুত। বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এক ঝটিকা সফরে এলেন মিঃ জিমি কার্টার। জাদুমন্ত্রে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের দুই নেত্রীকে এক টেবিলে বসালেন; মুরুব্বীয়ানা করলেন; অন্যান্য নেতাদের সাথেও বসলেন। টেলিভিশনে নেতা-নেত্রীদের হাসি দেখে বোঝা যায় জিমি কার্টারের বাংলাদেশ সফরে তারা কতই না সন্ত্রস্ত। ব্যাপারটা যদি উল্টোভাবে হিসাব করা হয় তাহলে? বাংলাদেশে কোন সাবেক রাষ্ট্রপতি কি আমেরিকার জর্জ ডব্লিউ বুশ, আলগোরকে নিয়ে এক সভায় বসিয়েছেন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে? বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দল-এর নেতাদের যেভাবে সিলেবাস দেন আমেরিকাসহ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রদূতগণ, আমাদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণ আমেরিকায় হোয়াইট হাউজে গিয়ে সেভাবে বলতে পারবেন কি? তা আমরা ভাবতেই পারি না। অথচ সেই আমেরিকার গণতন্ত্রের চেহারা খুবই বীভৎস। যে আমেরিকা অন্যকে গণতন্ত্র শেখায় তারা মহিলাদের ভোটাধিকার দিয়েছে ১৯২০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়ার তিন বছর পর।

গত বছর ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যে কারচুপি তা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে মিডিয়ার কল্যাণে। ঐ নির্বাচনে ১৩টি দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের ৩৩ শতাংশ কৃষ্ণাংগ পুরুষকে আইনের খাড়ায় ফেলে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে আছে- "গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত" নাগরিক ভোট দিতে পারে না যা 'ফেলোনি আইন' নামে পরিচিত। অভিযুক্তদের বলা হয় "ফেলোন"। ৩৩ শতাংশ কৃষ্ণাংগ এই ফেলোনি আইনের শিকার। শুধু কৃষ্ণাংগদের নয় ল্যাটিনো নাগরিকদেরও এই আইনের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়া হয়। এই হলো আমেরিকার গণতন্ত্র। কৃষ্ণাংগদের প্রিয় নেতা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বন্ধু মিঃ মার্টিন, লুটার কিংকেও আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী বেঁচে থাকতে দেয়নি। পাঁচ লক্ষের মত অসহায় শিশু মারা গেছে ইরাকে মার্কিন অবরোধের কারণে। ভিয়েতনামে এখনো অভিশপ্ত জীবন নিয়ে পংগু অসহায় নারী-পুরুষ-শিশু দিনাতিপাত করছে। জাপানে মার্কিন সৈন্যদের কুকীর্তি জাপানীদের প্রতিবাদে ফুঁপে তুলছে। সম্প্রতি আফগানিস্তানে তাদের এককালের দোসর বিন লাদেনকে ধরার নামে যে সন্ত্রাস তা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে। আর তাদের মুখে গণতন্ত্রের বুলি যেন ভূতের মুখে রাম নাম।

২.

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন জনসংহতি সমিতি বর্জন করেছে এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবী জানিয়ে চুক্তি

স্বাক্ষরের একটি অন্যতম পক্ষ জনসংহতি সমিতি এ নির্বাচন যুক্তিসংগত কারণে বর্জন করে। প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ নির্বাচন কমিশনের কাছে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দাবীনামা উত্থাপন করেও কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। পার্বত্য চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে 'উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল' হিসেবে স্বীকার করে তার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কথামালা লিপিবদ্ধ হলেও শাসকগোষ্ঠী সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। জুম্ম জনগণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মৌলিক ও যৌক্তিক দাবী শাসকগোষ্ঠী উপেক্ষা করেছে এমনকি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম দিন মধু পূর্ণিমার দিনে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা কি ভাবতে পারি শবে বরাতের দিন, ঈদুল ফিতরের দিন কোন নির্বাচন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে পারে?

নির্বাচনে যেভাবে টাকার ছড়াছড়ি তা সত্যি বিবেকবান, নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন দলীয় অফিস করে প্রতিদিন পর্যাপ্ত টাকা দিয়ে ঐ অফিস পরিচালনা করা হয়েছে। বেকার যুব সমাজের ভীড় তাই ঐসব অফিসে বেশী। টাকা দিয়ে মুরগী ক্রয়ের মতো ভোটও ক্রয় করা হয়। ভোট যেন বাজারের পণ্য। নির্বাচন আসলেই যারা যুব সমাজকে ব্যবহার করে সেসকল রাজনৈতিক দল চায় যুবসমাজ সবসময় সমাজবিমুখ, রাজনীতি বিমুখ করে গড়ে উঠুক। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলেছিলেন- "মানুষকে পশু বানাতে না পারলে পশুর কাজ মানুষকে দিয়ে করা সম্ভব নয়।" তাই ঐ সকল বৃহৎ রাজনৈতিক দল যুব সমাজের নৈতিক স্খলন ঘটিয়ে অনৈতিক কাজ সম্পন্ন করতে চায়। রাজনীতি হলো হৃদয়বৃত্তির ব্যাপার। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শ হচ্ছে ছোট। আদর্শহীন, নৈতিকতা-বর্জিত, মূল্যবোধহীন রাজনীতির প্রতি মানুষ দিন দিন বিমুখ হয়ে পড়ছে। এমনকি পাত্রীপক্ষও রাজনৈতিক পাত্র খোঁজেন না। অভিভাবক চান না তার ছেলে ভবিষ্যতে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ুক। আমাদের বিভিন্ন বোর্ডের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা মওলানা ভাসানী, সুভাষ বসুর মতো হতে চান না। তাদের ইচ্ছা তারা ডাক্তার, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি ইত্যাদি হবেন। এভাবে সূক্ষ্মভাবে দিন দিন মানুষ রাজনীতির প্রতি তাদের অনীহা প্রকাশ করছে। অথচ রাজনীতিই সমাজের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে; রাজনীতি যদি ভালো না হয়, মেধাবীরা যদি রাজনীতি না করেন তাহলে সুষ্ঠু রাজনীতির ধারা অব্যাহত থাকবে না।

দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে সমাজের বিকাশের ধারাকে সচল রাখতে যুবসমাজের সক্রিয় ভূমিকা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না। তারা পারিবারিক সমস্যা, দায়িত্বের কথা বলে সমাজের দায়িত্ব হতে সরে যেতে চান। যদি দেখি যারা রাজনীতির সাথে যুক্ত নন তারা ইচ্ছে করলেই কি তাদের পরিবার, মা-বাবা, ভাইবোন এর দায়িত্ব পালন করতে পারছে? বর্তমান বিশ্বে কয়েক মিলিয়ন বিবাহযোগ্য যুবক যুবতী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারছে না অর্থনৈতিক কারণে। হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক রাজনীতি না করেও তারা তাদের পরিবারকে কেন দেখতে পারছে না? কেন তারা বেকার? এর উত্তর সমাজ থেকেই খুঁজে নিতে হবে। গোটা সমাজের অগ্রগতি যেখানে বাধাগ্রস্থ হয় সেখানে ব্যক্তির অগ্রগতি অসম্ভব! পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের ফলে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরী পেয়েছেন, বিভিন্ন ছাত্র বিদেশে স্কলারশীপ পেয়েছেন তারা কি আন্দোলনের সুফল ভোগ করছেন না? উন্নয়ন বোর্ড, জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদসহ বিভিন্ন সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যারা চাকুরী করেন তাদের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই সুবিধাভোগীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির জনসংহতি সমিতিকে অস্বীকার করার তথা গোটা আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অথচ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের জীবন যৌবনের বিনিময়ে তাদেরই পরিচালিত আন্দোলনের ফলে অনেকেই আজ নিশ্চিন্তে গতানুগতিক জীবন যাপন করছেন তা চারপাশে চোখ বুলালেই দেখা যায়।

বর্তমান সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে সেই আন্দোলনের উপর ঐ সুবিধাভোগীদের বুদ্ধিজীবিসুলভ বক্তব্য শোনা যায়, ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধিতাও। যা সত্যিই দুঃখজনক। ব্যাপার যেন এরকম এক শ্রেণীর মানুষেরা গোটা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে আন্দোলন করবে, ত্যাগ করবে আর এক শ্রেণীর মানুষ বসে বসে তা ভোগ করবে। আন্দোলনকারীদের প্রতি তাদের কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করেছে। ইচ্ছে করলে সন্তু লারমারা এমপি, মন্ত্রী হতে পারতেন। তারা ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ আছেন। জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময় বিসর্জন দিয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নেয়া ডিগ্রি ২৪/২৫ বছর জঙ্গলে ফেলে রেখেছেন। আর আমাদের সমাজের কিছু শিক্ষিত শ্রেণী কখনও তথাকথিত নাগরিক কমিটি, সচেতন নাগরিক সমাজ নাম দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজের ফায়দা লুটার চেষ্টা চালিয়েছেন। সমাজের গতির বিপরীতে পথ চলতে তাদের সময়ে সময়ে পদে পদে হোচট খেতে হয়েছে। এটা তাদের শিক্ষণীয় যে, যারা জাতির 'স্বার্থ পরিপন্থী' কাজে লিপ্ত তাদের যে কোন এক সময় সমাজের প্রবল গতির ধাক্কা খেতে হয়। যে ধাক্কায় সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদীদের বালির দেয়াল, দুর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

৩.

বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার গঠন করেছে। পার্বত্য সমস্যা সমাধানে এ সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার দিকে নজর রয়েছে পার্বত্যবাসীর। অনেকের মধ্যে সংশয়, অনেকের মধ্যে আশার আলো লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ '৯১ সালে বিএনপির শাসনামলে ঘুর্ণিঝড়ের (২৯ এপ্রিল) মতো লোগাং, নানিয়ারচর গণহত্যা, রাঙামাটি ও বান্দরবানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জুম্ম জনগণ এখনও ভুলতে পারেনি।

কোন দল ক্ষমতায় গেলো, কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা ভাবার চাইতে জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করা যাবে তা বেশী ভাবাজ্য। আন্দোলন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে যেকোন দল, গোষ্ঠী দাবী পুরণে সচেষ্ট না হয়ে পারবে না। এটাই ইতিহাস।

◆

ইউপিডিএফ-এর সংসদ নির্বাচন নিয়ে কিছু কথা

তাপস দেওয়ান

সংসদ নির্বাচনের দিন দু'য়েক পর বাস চেপে মহালছড়ি যাচ্ছিলাম। বাস কুতুকছড়ি ছেড়ে কিছুদূর আসার পর একটা চায়ের দোকানের পাশে বাসটার দশ পনের মিনিটের জন্য হঠাৎ বিরতি। বাসের হেল্পার আমার সিটের পাশে একজন বাঙালী ব্যবসায়ীর কাছে এসে বলল - আপনি একটু নিচে যান। ব্যবসায়ীকে ভয়ে ভয়ে বাস থেকে নিচে নেমে পাশের দোকানের আড়ালে গিয়ে একজন যুবকের সাথে কথা বলতে দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ পর বিষন্ন মনে ফিরে এল। তার পাশের সিটে বসা একজন লোক, চেয়ারা দেখে পুলিশ কি সেনাবাহিনীর লোক মনে হলো, ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জানতে চাইলেন - কি ভাই ওখানে গেলেন কেন? ব্যবসায়ী উত্তর দিলো - ট্যাক্স।

পাশের সিটে বসা লোকটি পুনঃ জানতে চাইলো- কিসের ট্যাক্স? ব্যবসায়ী উত্তরে জানালো- এখানে পাহাড়ী বাঙালী যারা ব্যবসা বা মালামাল আনা নেয়া করে সবাইকে ট্যাক্স দিতে হয়। ট্যাক্স না দিলে ব্যবসা বা মালামাল আনা নেয়া করা যায় না।

এরপর বাঙালী ব্যবসায়ী আরও জানালো- গত নির্বাচনে এরা মানে ইউপিডিএফ প্রচুর টাকা খরচ করেছে। তাই এখন তাদের খুব আর্থিক সংকট। পুর্বের তুলনায় তারা মানে ইউপিডিএফ কর্মীরা চাঁদা সংগ্রহে খুব কড়াকড়ি এবং বর্তমানে তারা আরও যত্রতত্র ট্যাক্স তোলার পোষ্ট বসিয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে এদের সখ্যতা রূপকথার মতো। এরা দেখেও না দেখার ভান করে চলে। তাই নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে সাহায্য চাইলেও কোনো লাভ হয় না।

পরে আরও জানা গেল যারা সাধারণ মানুষ তারা এ ট্যাক্সের কথা শুনলে এখন শিউরে উঠে। একজন সাধারণ কৃষক যে থাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৪/৫ মাইল দূরে তাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটায়। সে একটা কলা ছড়া বিক্রয় করে বড়জোর ৩০/৩৫ টাকা পায়। ছড়া ছোট হলে আরও কম। অথচ তাকে ইউপিডিএফ কর্মীদেরকে চাঁদা দিতে হয় প্রতি কলাছড়ার জন্য ৫ টাকা। একবস্তা ধান বা চাউলের জন্য দিতে হয় দশ টাকা। এভাবে নানা প্রকারের ধার্য ট্যাক্স দেখে মানুষ এখন শিউরে উঠে। সাধারণ মানুষকে যারা এভাবে দুঃখ দেয় বা হয়রানী করে তারা নাকি আবার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বুলি আওড়ায়। তারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের কথা বলে। সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলে। কিন্তু কার জন্য এ ট্যাক্স? কিসের জন্য মুক্তিপণ আদায়? কার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন?

ধরে নিলাম এ ট্যাক্সের টাকা দিয়ে ইউপিডিএফ কর্মীরা অস্ত্র কিনবে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার হবে? নিরীহ জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে নয় তো? কারণ এ অস্ত্র তারা ব্যবহার করতে পারবে না কোন নিরাপত্তা বাহিনী বা পুলিশের বিরুদ্ধে এবং সেটি সম্ভবও নয়। সেই ট্রেনিং তো তাদের নেই। সে রকম ভারী অস্ত্রও তাদের নেই। তবু তারা যদি এভাবে ট্যাক্স তুলে, মুক্তিপণ আদায় করে, ঢাকায়, চট্টগ্রামে বসবাস করে যদি পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দিবাস্বপ্ন দেখে তখন তাদেরকে বলার কিছু নেই। তবে একথা পরিষ্কার যে, পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের বুলি জনগণকে বিভ্রান্ত করে তাদের অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন অপকৌশল নয়।

ইউপিডিএফ কর্মীরা এখন পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের কথা ভুলে গেছে। কারণ এজন্য তাদের নেই কোন জোরালো কর্মসূচী বা সুস্পষ্ট বক্তব্য। তারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন! পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন!! বলে ডাক ছাড়লেও আজ অবধি কোন কর্মসূচি দাঁড় করাতে পারেনি। তাদের এখন একটাই কর্মসূচি তা হল - জেএসএস হঠাও। তারা এখন বক্তৃতায় বা বিবৃতিতে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের কথা কমই বলে। তবে তারা এখন তাদের এই তথাকথিত প্রাণের দাবীর বদলে হিরোইনখোর, মদখোর, গাঁজাখোরদের দমন, বনজ সম্পদ, বনজ প্রাণী, পরিবেশ রক্ষায় কোমর বেঁধে নেমেছে।

এ প্রসংগে আমার এক রসিক বন্ধুটির কথাও একটু যোগ করে দিতে চাই। আমার এই রসিক বন্ধুটি এখন প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবের আসরে বলে বেড়ান- ইউপিডিএফ কর্মীরা এখন পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের কথা ভুলে গেছে। কারণ এজন্য তাদের নেই কোন জোরালো কর্মসূচী বা সুস্পষ্ট বক্তব্য। তারা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন! পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন!! বলে ডাক ছাড়লেও আজ অবধি কোন কর্মসূচি দাঁড় করাতে পারেনি। তাদের এখন একটাই কর্মসূচি তা হল - জেএসএস হঠাও। তারা এখন বক্তৃতায় বা বিবৃতিতে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের কথা কমই বলে। তবে তারা এখন তাদের এই তথাকথিত প্রাণের দাবীর বদলে হিরোইনখোর, মদখোর, গাঁজাখোরদের দমন, বনজ সম্পদ, বনজ প্রাণী, পরিবেশ রক্ষায় কোমর বেঁধে নেমেছে। তাই রসিক বন্ধুটির প্রশ্ন- ইউপিডিএফ কি পরিবেশবাদী না সমাজ সংস্কারকারী না বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী দল। তবু যেন জনমনে প্রশ্ন জাগে- ইউপিডিএফ-এর তথাকথিত প্রাণের দাবী পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এত সহজে, এত অল্প ইউপিডিএফ কর্মীদের দ্বারা ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেল!

বর্তমানে ইউপিডিএফ নেতা কর্মীরা তাদের তথাকথিত প্রিয় ও প্রাণের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী যে ভুলে গেছে তা তাদের কর্মসূচি ও কর্মকান্ড থেকে পরিষ্কার। আসলে তারা এতদিন তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ধুম্রজাল সৃষ্টি করে ধূয়া কুন্ডলী পাকিয়ে ফায়দা লুটার

চেষ্টা করেছে। কিন্তু এর মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষের তেমন সাড়াশব্দ পায়নি। তাই তাদের এখন তথাকথিত দাবী পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের কথা ভুলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। সাধারণ মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে তাদের আসল উদ্দেশ্য কি? ইউপিডিএফ নেতা কর্মীদের মূল উদ্দেশ্য যেনতেন প্রকারে কোন পদ, ক্ষমতা বা অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া। নিজেদের মধ্যে অনেক মতবিরোধও চলছে। তারা ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীরা আন্ডার গ্রাউন্ড বা ওভার গ্রাইন্ড তা পাবলিক বুঝতে পারে না; শুধু তারাই বুঝে। সময় সুযোগ বুঝে তারা ঝোপের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ বের হয়ে আসে আবার অদৃশ্য হয়।

তবে এযাবৎ তাদের যে কৌশল তা হল পার্বত্য শান্তিচুক্তির ব্যাপারে ধুয়ো তুলে কিছু উচ্ছৃঙ্খল, ভবিষ্যৎহীন কচি বয়সের ছেলেকে বিভ্রান্ত করে চাঁদাবাজি, খুন, অপহরণ ইত্যাদির কাজে লাগিয়ে নিজেরা টু পাইস কামাই করে অর্থবিত্ত, সম্পত্তির মালিক হওয়া এবং কল্প-দীপংকর-বীর বাহাদুরসহ কিছু সরকারী দলের হোমরা-চোমরাদের সাথে গোপন সম্পর্ক রেখে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে বাঁধা সৃষ্টি করা, নির্বিঘ্নে অপরাধ কর্ম করে যাওয়া। কিন্তু তিনজন বিদেশী অপহরণের মুক্তিপণের টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ইউপিডিএফ ও কল্প-দীপংকর যে নাটক তৈরী করল তা বুঝে উঠতে সাধারণ মানুষের কোন অসুবিধা হয়নি। শেষ পর্যন্ত মুক্তিপণের টাকা ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে এক প্রকার টাগ অফ ওয়ার শুরু করে নাটকের সমাপ্তি টানতে হল। এই তিনজন বিদেশী অপহরণের মাধ্যমে কল্পবাবুরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্মকান্ডের যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেন তা কোনদিনই পূরণ হবার কথা নয়। কল্পবাবুদের সাথে ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীরা শেষ পর্যন্ত পার্বত্যবাসীকে উন্নয়নের দ্বারপ্রান্ত থেকে অনিশ্চিত অন্ধকারে, প্রতিটি জুম্ম নরনারীকে পঙ্গু বানিয়ে ছেড়ে দিল। কোন সচেতন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কি এহেন জঘন্য কাজে শরীক হতে পারে?

দীপংকর-কল্পবাবুসহ কিছু ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ইউপিডিএফ নেতাকর্মীদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে সখ্যতা বজায় রেখে চলতেন। ঢাকায় কল্পবাবু তো এদেরকে জামাই আদর করতেন। এসব আদর-আপ্যায়ন অবশ্য কল্পবাবু করতেন সব সময় ইলেকশনের কথা মাথায় রেখে। এবারের ইলেকশনে কল্পবাবুদের স্বপ্নভংগ হলো। ইউপিডিএফ থেকে ইলেকশনে সমর্থন পাওয়ার কথা আশা করলেও কল্প-দীপংকর-বীর বাহাদুর তা পাননি। বরং তাদের বাড়া ভাতে ছাই মেখে দিয়েছে ইউপিডিএফ। এবার কল্পবাবুরা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন দুধ কলা দিয়ে এতদিন কি পোষে এসেছেন। সুযোগ সন্ধানী ইউপিডিএফ আগে ছিল কল্পবাবুদের ছত্রছায়ায়। এখন কল্প-দীপংকর তাদের ধমকাচ্ছে অপাংক্তেয় বলে। সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তার অজুহাতে তারা এখন প্রশাসন-আর্মি-পুলিশ আর বিডিআর-এর ছত্রছায়ায়। এত জনসমর্থন তাদের গেল কোথা? ইউপিডিএফ নেতাকর্মীরা এখন সংসদে গিয়ে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন কায়েমের স্বপ্ন দেখছেন। আসলে এদের মূল উদ্দেশ্য সংসদ নির্বাচন নয়। এ কথা এখন স্পষ্ট যে, তাদের মূল উদ্দেশ্য সংসদ নির্বাচনের নাম করে যেনতেন প্রকারে ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে আসা। বর্তমানে নাকি তাদের কর্মী বাহিনী খুব হতাশ। অনেকে নানা কঠিন রোগে আক্রান্ত। অনেকের চাকুরীর বয়স যায় যায় অবস্থা। ইউপিডিএফ নেতাকর্মীদের সিংহভাগের মত এখন লুকিয়ে থাকার বিপক্ষে। অন্যদিকে জেএসএস-এর সাথে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেও তারা বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। তাই ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে সাধু সাজার এ পথ দীর্ঘদিন পর খুঁজে পেল- সংসদ নির্বাচন। কিন্তু সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তারা যে তামাশা দেখালো, নাটক অভিনয় করলো, তাতে তাদের সব হাড়ির গোপন খবর প্রকাশ হয়ে পড়ল।

এখন পরিষ্কার যে, তারা পুনর্বাসিত সেটেলারদের ভাই হিসেবে বরণ করে নিয়ে তাদের সব আদর্শকে ধূলি মেখে জন সমক্ষে তুলে ধরেছে। এ ইস্যুতে নেই তাদের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য বা কর্মসূচী। অথচ তারা কি জানে না এ ইস্যুর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি, ভূমি সমস্যাসহ অনেক সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু তারা এখন অত্যন্ত সচেতনভাবে এ ইস্যুটিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ফায়দা লুটবার চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ তারা জুলাইয়ের ষোল-সতের তারিখ জেএসএস-র ডাকা হরতালকে সমর্থন জানিয়ে পেপারে বিবৃতি দিয়ে ভালো মানুষ সেজেছে। তারা আবার সেই ভোটার তালিকায় নির্বাচনে অংশ নিল। এর চেয়ে ভন্ডামী আর কি হতে পারে? বর্তমানে তাহলে তারা সেটেলারদেরকে কাঁধে নিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায়? তাই এ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তারা শুধু তাদের আসল চেহারা জন সমক্ষে তুলে ধরল না; সাথে সাথে কিছু প্রশ্ন তারা জনমনে সৃষ্টি করল। তাদের এ নির্বাচনে তারা যে লাখ লাখ টাকা খরচ করল এ টাকার উৎস কোথায়? তারা কোন কালো শক্তির হাতে পুতুল নাচন দিচ্ছে না তো?

এ কথা এখন স্পষ্ট- ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীরা উচ্ছৃঙ্খল ও পদভ্রষ্ট স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেদের বিভ্রান্ত করে জল ঘোলাটে করতে চায়। তাদের নেই কোন স্পষ্ট বক্তব্য বা উদ্দেশ্য। আজ এটা বলছে - কাল বলবে ওটা। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় তারা যেমন যত্রতত্র সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরণ, খুন খারাবি করছে তেমনি ক্ষমতালোভী, কালো শক্তির হাতে তারা পুতুল নাচনও নেচে যাচ্ছে। কান্ডারীহীন তরীর মতো তারা এখন দিক-বিদিক ছুটে চলছে। তাদের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন তো ভাওতাবাজী ছাড়া কিছু নয়। তাদের এই তথাকথিত দাবীর পেছনে নিহিত আছে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য। তাদের এ সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের মুখোশ খসে পড়ে আসল চেহারাটাই ফুটে উঠেছে।

সংসদ নির্বাচনের দিন দু'য়েক পর আবার হঠাৎ আমার সে রসিক বন্ধুটির সাথে আবার দেখা। সংসদ নির্বাচন বিষয়ে আলাপ হতেই তিনি বললেন- ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীরা বহু আগেই তাদের তথাকথিত দাবী পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনকে কবর দিয়েছে। এবার বিতর্কিত ভোটার তালিকায় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে তারা কবর দিল তাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন ইউপিডিএফ'কে। তারপর মুখে এক ঝলক হাসি। আমার বন্ধু তনয় সাথে সাথে প্রশ্ন জুড়ে দিলেন- শুধু ইউপিডিএফ কেন? এ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতালোভী, জুম্ম জাতির কলঙ্ক কল্প-দীপংকরসহ সব বেঈমান-প্রতারকদেরই কবর রচিত হয়েছে। এ কবর তারা নিজেরাই এতদিন সযত্নে খুঁড়ে খুঁড়ে তৈরী করেছেন।

◆

পার্বত্য রাজনীতি ও জুম্ম জনগণ

তাতিন্দ্র লাল চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে স্পষ্টতই দু'টো ধারা বিদ্যমান। একটা হচ্ছে অস্তিত্ব রক্ষার রাজনীতি আর অন্যটি হচ্ছে অস্তিত্বহীন করার রাজনীতি। জুম্ম জনগণের ব্যাপক অংশ যারা জমি চাষী তারা জানে না আগামীতে তাদের চাষাবাসের কোন উন্নতি হবে কিনা? এ বছরের যে চাষ তা আগামী বছরও ঠিক থাকবে কিনা তা কেউ জানে না। বিশেষতঃ জলেভাসা জমি চাষী হলে তার অনিশ্চয়তা আরো বেশী। একজন জুমচাষী সে আরো বেশী অনিশ্চিত। তার আগামী বছরের কোথায় জুম চাষ হবে বা আদৌ হবে কিনা তার নিশ্চয়তা কোথাও নেই। একইভাবে ক্ষুদে ব্যবসায়ী যারা তাদের অনিশ্চয়তাও সবচাইতে বেশী। বিভিন্ন সরকারী বা আধা-সরকারী চাকরী যারা করেন তাদের কয়েক বছরের কিছুটা নিশ্চয়তা থাকলেও ভবিষ্যতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ঠিক থাকবে কি থাকবে না, উন্নতি হবে কি হবে না তাও কোন নিশ্চয়তা নেই। শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী হলে তার পরিস্থিতি আরো খারাপ। নিজেদের এই অনিশ্চয়তা শ্রেণী হিসেবে শুধু নয়, কি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা বা অন্য কোন জুম্ম জাতির লোকের জন্যেই এটা প্রযোজ্য। বরঞ্চ জাতি হিসেবে যত ক্ষুদ্র হবে, শ্রেণী হিসেবে যত পশ্চাদপদ হবে ততই তাদের এই অনিশ্চয়তা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে এবং খাবে। এই অনিশ্চয়তা কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক সর্বত্রই। আর এই অনিশ্চয়তা থেকেই জন্ম নিয়েছে নিজেদের শ্রেণীগত এমনকি জাতিগতভাবে ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা। তাই জুম্ম জনগণের ব্যাপক অংশ প্রচলিত রীতি প্রথা বা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন কামনা করে। এই পরিবর্তন কামনার ধারাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের আধুনিক জুম্ম রাজনীতির ধারা।

অপরদিকে তার বিপরীতে আছে শাসকশ্রেণী - যারা ইসলামী ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে। তাদের আশংকা একদিন হয়তো বা পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই রাজনীতির ধারক-বাহক সামরিক-বেসামরিক আমলারা যারা রাষ্ট্রযন্ত্রের যাবতীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে জুম্ম জনগণের রাজনীতির বিরোধীতা করছে। স্পষ্টতই এই দুই ধারা সত্তর দশকের শুরু থেকে নতুন শতাব্দী পর্যন্ত টানাভাবে চলে আসছে।

জুম্ম রাজনীতির নেতৃত্বে আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি যার আছে ব্যাপক ত্যাগী কর্মী। কিন্তু জনসংহতি সমিতির এই নেতৃত্ব নিরংকুশ নয়। যুগে যুগে সময়ে সময়ে এই রাজনীতির বিরোধীতা করতে বিরোধী ধারায় অনেকে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ফলে বহু বৈচিত্রের অধিকারী হয়েছে এই রাজনীতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুম্ম জনগণের ব্যাপক অংশটি যারা গ্রামাঞ্চলে সহজ সরল জীবনে অভ্যস্থ তারা বরাবরই ছিল জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে। গ্রামের কিছু কিছু সচেতন বয়স্ক লোক যারা গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সামাজিক বিচারাদি নিষ্পন্ন করার মহান গুরু দায়িত্ব বহন করেছিল। আর শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত তরুণেরা যারা সশস্ত্র আন্দোলনে কিংবা যুব সমিতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারাই ছিল এই রাজনীতির ভিত্তি।

কিন্তু এই রাজনীতির বিপরীতে যে পার্বত্য রাজনীতি ছিল তাতে শাসকশ্রেণীর নানা প্রলোভনে অনেকেই পা দিয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্য। গ্রামাঞ্চলে কার্বারী বা চেয়ারম্যান বানিয়ে মুষ্টিমেয় লোককে ব্যক্তি স্বার্থ চিন্তায় আকৃষ্ট করলেও তারা গোপন সংবাদ সংগ্রহকারী ব্যতীত বেশী কিছু করতে পারেনি। কিন্তু রাজনীতিগতভাবে কিছু কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে আধুনিক শিক্ষিত পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী যাদের রাজনীতি ও অন্যান্য উচ্চাভিলাষ রয়েছে। সেই বিভ্রান্তিকারী রাজনীতি অনেকেই করেছে কিন্তু তিরিশ বছরের রাজনীতির ফলাফল হিসেব করলে দেখা যাবে এইসব বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীরা সমাজে সুনির্দিষ্ট কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনি। এমনকি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এই শ্রেণীটা নিজেরাও সুসংগঠিত হতে পারেনি বা সরকার তাদেরকে সুসংগঠিত হতে দেয়নি। তারা ছিটেফোটাভাবে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা সাময়িকভাবে পেয়েছে কিন্তু স্থায়ীভাবে কিছুই লাভ করতে পারেনি। বিপরীতে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা দালাল উপাধি পেয়েছে। এমনকি শাসকশ্রেণীর লেলিয়ে দেয়া বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

যাই হোক জুম্ম জনগণের প্রধান রাজনৈতিক ধারার সর্বশেষ রূপটি দেখা গেল বিগত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধ করার সংগ্রামে। এই সংগ্রামে জুম্ম জনগেণর সর্বস্তরের পূর্ণ সমর্থন দেখা গেছে। কারণ জুম্ম মাত্রই ভাবে - যে হারে বহিরাগত বাঙালীদের সংখ্যা এই পার্বত্য চট্টগ্রামে বেড়ে চলেছে তাতে ইতিমধ্যে পাহাড়ী-বাঙালী সমান, কোথাও কোথাও বাঙালীর সংখ্যা বেশী। তাতে করে এই গতি বজায় থাকলে আগামী ১০/২০ বছরে জুম্ম জনগণের চাইতে বহিরাগত বাঙালীরা দুইগুণ, তিনগুণ বা ততোধিকও হয়ে যেতে পারে। এভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার ফলশ্রুতিতে জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এমনকি ভোটের অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুম্ম জনগণের সমস্ত অংশটি কি সংগ্রামে দৃঢ় থাকতে পেরেছে? না পারেনি। জুম্ম জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নির্বাচন থেকে সরে থাকেনি। বিশ্লেষণ করেল দেখা যাবে সমাজে রাজনৈতিকভাবে যারা সচেতন বা অগ্রগামী তারা এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। যাবা মধ্যবর্তী পর্যায়ে ছিল তারা দৃঢ়ভাবে ভোট বর্জন করার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু সমাজের যে অংশটি পশ্চাদপদ তারা ভোট দিয়েছে। ভোট দিয়ে কি অপরাধ করেছে? না করেনি। বরঞ্চ বলা যাবে তারা ঠিক ততটা সচেতন হয়নি যা বিরোধীতা করার পর্যায়ে যাবে। কারণ ভয় করার অনেক কিছু ছিল, লোভ লালসা করার মতো অনেক কিছুই ছিল। পশ্চাদপদ বলতে তারা কিন্তু অশিক্ষিত নয় তারা অনেকেই উচ্চ শিক্ষিতও রয়েছেন। পুঁথিগত বিদ্যায় তারা অনেক পারদর্শী। কিন্তু যা নেই তা হচ্ছে রাজনৈতিক উপলব্ধি। এই রাজনৈতিক অসচেতনটাই হচ্ছে পশ্চাদপদতা। অনেকে ঘন্টার পর ঘন্টা লেকচার দিতে পারে কিন্তু জুম্ম জনগণের ঠিক কোন জিনিষটি দরকার, কোন অধিকারটি জুম্ম জনগণকে টিকিয়ে রাখবে এবং বিকশিত করবে সেটা না বুঝাই হচ্ছে পশ্চাদপদতা। যেমন প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে মনপুত হয় না। মুখে তারা আরো অনেক কিছু পেতে চায়, কিন্তু কাজে কর্মে করলো তত্ত্বাবধায়ক ও আওয়ামী লীগ সরকারের দালালী। যাকে মুখোশ বাহিনীর চেয়েও অধম বলা যায়। কারণ মুখোশ বাহিনী জুম্ম জনগণের উপর অনেক অনেক ক্ষতি ও হয়রানি করেছিল কিন্তু জনগণের

ভোট ডাকাতি করেনি। কিন্তু প্রসিত-সঞ্চয় বাহিনী সব কিছু করার পরও জনগণের ভোট ডাকাতি করে নিজেদের সস্তা জনপ্রিয়তা দেখিয়েছে। এটা ১৯৮৯ সনের সেনা সদস্যদের করতে দেখা গেছে। এবারে দেখা গেল প্রসিত-সঞ্চয় বাহিনীও তাই করতে পারলো।

প্রসিত বাহিনী যে পশ্চাদপদ তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের কার্যকলাপে। তার দু'একটা যেমন - প্রসিত-সঞ্চয়দের প্রচারপত্রে দেখা গেছে - "ভোটার তালিকা থেকে বহিরাগতদের বাদ দেওয়ার জনসংহতি সমিতির দাবীটি তারা সমর্থন করে"। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল ঐ বহিরাগতদের দিয়ে প্রণীত ভোটার তালিকায় তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এটা একটা নিরেট ভন্ডামী ছাড়া আর কি বলা যাবে? প্রসিত নিজেই ঘোষণা করলো যে এতদিন তারা রাজপথে সংগ্রাম করেছে এবার সংসদে দিয়ে সংগ্রাম করবে। যেন গাছে কাঠাল গোঁফে তেল। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা যখন প্রসিতকে প্রশ্ন করেছেন যে, এর অনেক আগেই তো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদে গিয়ে লড়াই করেছেন, দাবী-দাওয়া পেশ করেছেন। তাতে কোন কিছুই হয়নি বলেই তো তিনি সশস্ত্র আন্দোলন করেছেন। তাহলে আজকে আপনি যে বক্তব্য দিচ্ছেন তা আরো ২০/৩০ বছরের পুরানো কথা হচ্ছেনা? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়া ঐ প্রসিত মাস্তানের সম্ভব হয়নি। মুখ্যতঃ যতিনবাবু যাই বলতে চেয়েছেন - যেখানে অধিকার আদায়ের জন্য জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা দরকার সেখানে এই চক্ররা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এটা জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাই তারা শিক্ষিত হতে পারে, মাস্তানীতে পটু হতে পারে, বিদেশী অপহরণ নাটকে সুচতুর অভিনয় করতে পারে কিন্তু জুম্ম রাজনীতিতে তারা পশ্চাদপদ - এটাই প্রমাণিত। তাই বলা যায় যা কিছু জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, মঙ্গল বয়ে আনে, তাই হচ্ছে প্রগতিশীলতা। আর যা কিছু জুম্ম জনগণকে বিভ্রান্ত করে, অনৈক্য সৃষ্টি করে তাহলো প্রতিক্রিয়াশীল।

কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে জুম্ম জনগণ আগের চাইতে অনেক বেশী ঐক্যবদ্ধ, অনেক বেশী সচেতন। তার প্রমাণ দেখা গেছে বিগত সংসদ নির্বাচন বর্জনের সময়ে। কারণ এই সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত কঠিন এক সংগ্রাম - যে সংগ্রামের বিপরীতে সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল অত্যন্ত সক্রিয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রচারমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলোর ছিল চরম বিরোধীতা। সর্বোপরি নির্বাচনী ডামাঢোলে লক্ষ কোটি টাকার দাপটে যাবতীয় লোভ-লালসা উগ্র স্বভাবে হাজির হলেও জুম্ম জনগণের এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ আছে যা থেকে একটা ভোটও কোন শক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেনি। এই অবস্থা দেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্তব্যরত জনৈক সেনা কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন - "এটাকেই বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম"। কারণ তিনি নাকি অনেক ভোট বর্জন দেখেছেন কিন্তু কোন কোন ভোট কেন্দ্রে একটা ভোটও পড়েনি এরকম নজির নাকি জীবনে কোথাও দেখেননি। প্রতিপক্ষ হয়েও তিনি জুম্ম জনগণের ঐক্য সংহতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাই দেখা যায় জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতি এমনই জোরদার হয়ে উঠছে যে, পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজনীতি আশু জরুরী বিষয় হচ্ছে - চুক্তি মোতাবেক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে জেলা পরিষদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। কারণ গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য জেলাগুলোতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হয় না। এটা গণতন্ত্রের অবমাননা করা এবং নিজেদের অগণতান্ত্রিক চরিত্রকেই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এছাড়াও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও শরণার্থী পুনর্বাসন, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিসহ পার্বত্য চুক্তির বিভিন্ন দিক অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করা দরকার। তা করা না হলে যে অনিশ্চয়তা জুম্ম জনগণের মধ্যে বিরাজ করছে তার আরো অবনতি হবে এবং পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেবে। কারণ এই চুক্তির মধ্যে জুম্ম জনগণের সকল স্তরের অর্থ, মেধা, শ্রম এমনকি রক্ত জড়িয়ে রয়েছে। এই চুক্তি অবজ্ঞা করা, অবহেলা করা পার্বত্য রাজনীতির জন্য কখনো শুভ হবে না। পার্বত্য রাজনীতিতে অঢেল টাকা ব্যয় করে সাময়িক কালের জন্য প্রসিত-সঞ্চয়দের মতো দালাল সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যাবে কিন্তু স্থায়ী কোন সমাধান দেয়া যাবে না। জুম্ম জনগণকে তাদের মধ্যেকার যে অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করার মধ্যে যে আশংকা পার্বত্য রাজনীতিতে কাজ করছে সেই আশংকা স্থায়ীভাবে দূর করা যাবে, অন্যথায় নয়।

পার্বত্য রাজনীতির ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার স্থানীয়ভাবে উপজেলা নির্বাচন ও ইউপি নির্বাচন করার পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে ও নেবে। কিন্তু বর্তমান ভোটার তালিকা অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলায় ২৫টি উপজেলার মধ্যে ১৪টিতে বাঙালী ভোটারদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। কাজেই এই অবস্থায় স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জুম্ম জনগণের স্থানীয়ভাবে পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ থাকবে না। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ১০-২০ বছরে ইউপি নির্বাচনেও জুম্ম জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হবে না এবং অদুর ভবিষ্যতে এর ফল দাঁড়াবে বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা যেমন সাচ্ছন্দ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি এবং ভোট দিয়ে যে চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে জুম্ম জনগণের অবস্থাও তাই হবে।

অদূর ভবিষ্যতে জুম্ম জনগণ ভোটাধিকার কেন নিজ ভিটেমাটি থেকেও উচ্ছেদ হতে বাধ্য হবে। এই অনিবার্য পরিণতি থেকে জুম্ম জনগণ যেহেতু রেহাই পেতে চায় সেহেতু তাদের নিজস্ব স্বার্থে জুম্ম রাজনীতি না করে উপায় থাকে না। কিন্তু তা করতে গিয়েই পার্বত্য রাজনীতির সাথে রাজনৈতিক মতবিরোধে জড়িয়ে পড়তে হয়। তাই স্থানীয় জুম্ম জনগণের স্বার্থে যারা কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী বা বিচ্ছিন্নতাবাদীর অভিযোগ তোলা হয়। অথচ গণতন্ত্র চর্চায় স্থানীয় গণতন্ত্রটাই হচ্ছে ভিত্তি এবং সেখানে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। কিন্তু পার্বত্য রাজনীতির ধারক বাহকেরা শুধু দালাল সৃষ্টি করার মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাই করে এসেছে। এটাই হচ্ছে নির্মম বাস্তবতা। এই বাস্তবতার আলোকে প্রতিটি জুম্ম নরনারীকে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার, ভবিষ্যতে টিকে থাকার অধিকারের কথা ভাবতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা করার বিধান রাখা হয়েছে। এটা জুম্ম জনগণের ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত দাবী। জুম্ম জনগণ এ দাবী থেকে কখনো সরে যেতে পারবে না। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে হবে। এর অন্য যেকোন বিকল্প ব্যবস্থা সমস্যাটাকে জটিল করে তুলবে বৈ কোন সমাধান দিতে পারবে না।

◆

পাহাড়ে গণ-মানুষের স্বার্থ ও আঞ্চলিক পরিষদ*

মঙ্গল কুমার চাকমা

পাহাড়ে গণ-মানুষের স্বার্থ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিষয়টি মূল্যায়ণের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতির পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। এই সূত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ইতিহাসকে কিছুটা হলেও উল্লেখ না করলে হয় না।

পাহাড়ের আদিবাসী পাহাড়ীদের স্বার্থের রক্ষাকবচ ছিল বৃটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি - যা ছিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল নামে সমধিক পরিচিত। কিন্তু কালক্রমে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই শাসনবিধির নানা ধরনের সংশোধনী আনা হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের সময় তার অবশিষ্টাংশটিও বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে সংবিধানে পাহাড়ের আদিবাসী জনগণের আলাদা রাজনৈতিক অস্তিত্বের কোন ধরনের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি ছিল না। তাই দশ ভাষাভাষি পাহাড়ী জনগণ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবলুপ্তি হবার সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ সময়ের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে।

তদানীন্তন জিয়া সরকার অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে শান্ত না দেয়ার প্রত্যাশায়, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী পাহাড়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু দীর্ঘ দুই দশকের অধিক দিন এই প্রক্রিয়া পাহাড়ের পাদদেশে চালু থাকলেও মূলতঃ সমস্যার কোন সমাধান এই উন্নয়ন বোর্ড দিতে পারেনি। পক্ষান্তরে জুম্ম জনগণ চরমভাবে প্রতারিত হয়েছে এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দমনে এই বোর্ড হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতপর এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিন ভাগে ভাগ করে তিন পার্বত্য জেলায় রূপ দেয়া হয়। প্রশাসনিক এই সংস্কারও জুম্ম জনগণের স্বার্থে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সরকারের এই উদ্যোগ ছিল মুখতঃ জুম্ম জনগণের ঐতিহাসিক ঐক্যসত্ত্বাকে খন্ডিত করা এবং 'ভাগ করো শাসন করো' ঔপনিবেশিক নীতি প্রয়োগ করা। অবশেষে এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৬ সাল থেকে জনসংহতি সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক শুরু হয়। শুরুতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকার করলেও কার্যতঃ গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

শেষ অবধি ১৯৮৯ সালে জনসংহতি সমিতির উত্থাপিত পাঁচদফা দাবীনামার পরিবর্তে তখনকার সরকার পক্ষ 'নয়দফা রূপরেখা' সম্বলিত প্রস্তাব দেয়। উল্লেখিত নয়দফা রূপরেখা জনসংহতি সমিতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে সরকার সুবিধাভোগী ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর সাথে আপোষ-মীমাংসা স্বরূপ তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করে। উক্ত স্থানীয় সরকার পরিষদ না মানার ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতির বহুবিধ কারণ থাকলেও প্রধান কারণ ছিল তিনটি পার্বত্য জেলার মানুষকে 'ভাগ করে শাসন করা'র নীতির বিরোধীতা করা। কারণ জনসংহতি সমিতি মনে করে অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম তিন ভাগে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর ঐক্য ও সংহতির উপর এই নীতি সবচেয়ে বড় বিভেদই সৃষ্টি করে দেবে। মূলতঃ এই ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদের অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমুহের মধ্যেকার ঐক্য ও সংহতিকে বজায় রাখা এবং এই ঐক্য ও সংহতিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া।

যাহোক, এই আঞ্চলিক পরিষদ পাহাড়ের আদিবাসী জনগণের স্বার্থ মূলতঃ সংরক্ষণ করতে পারবে কি পারবে না সেটা নির্ভর করবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিনিধিত্ব করছে তারই উপর। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নসহ আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও অধিকার সফলভাবে কার্যে রূপদানের উপরই পাহাড়ী জনতার স্বার্থ নির্ভর করছে।

পাহাড়ে আদিবাসী জনগণের স্বার্থ ও আঞ্চলিক পরিষদ প্রসংগে আলোচনা করতে গেলে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক স্পিরিটকে মূল্যায়ণ করা দরকার। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে - পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে দশ ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি এবং বৃটিশ শাসনামল থেকে এই অঞ্চল বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেবে শাসিত হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের এই স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক বিশেষ মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদার প্রধান দিক হলো এই অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বসবাসরত আদিবাসী পাহাড়ীদের সমাজ, কৃষ্টি, ভাষা, অর্থনৈতিক জীবনধারা, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বাংলাদেশ অপরাপর অঞ্চলের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্ত্বার অধিকারী। আদিবাসী পাহাড়ীদের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্বের উপর দীর্ঘকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদী, উগ্র-জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী শক্তিসমূহ আঘাত করে আসছে এবং এই সব অপশক্তির আগ্রাসন ও কালো থাবা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ আদিবাসী পাহাড়ীদের এই বিপন্ন অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে রক্ষার ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য - আদিবাসী পাহাড়ীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার। আদিবাসীগণ যুগ যুগ ধরে এই ঐতিহ্যগত ভূমি প্রথাকে অনুসরণ করে আসছে। এই ভূমি প্রথা অনুযায়ী পাহাড়ীরা ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অধিকার ছাড়াও ভূমির উপর সামাজিক মালিকানা স্বীকৃত ও প্রচলিত। এই প্রথা অত্যন্ত সহজ-সরল আদিবাসী জীবনধারার

সাথে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু দেশের প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনায় পাহাড়ীদের এই ঐতিহ্যগত ভূমি প্রথা স্বীকৃত নয়। অপরদিকে পাহাড়ীরা দেশের প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিল প্রক্রিয়ার সাথে অপরিচিত ও অনভ্যস্ত। এই স্বৈত যাঁতাকলে পাহাড়ীদের ভূমি এযাবৎ বেহাত হয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদ আদিবাসী পাহাড়ীদের এই প্রথাগত ভূমি অধিকার রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি পাহাড়ীদের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, পদ্ধতি ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আদিবাসীদের সামাজিক ভিতকে মজবুত করতে পারবে বলে প্রতীয়মান হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা এবং তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদ এর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারার ক্ষমতা রয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে - এযাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উন্নয়ন বলতে যা বুঝায় সেইরূপ উন্নয়ন পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সুযোগ বঞ্চিত তৃণমূল পর্যায়ের পাহাড়ী জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মৌলিক কোন উন্নয়ন সাধিত হয়নি। এই উন্নয়ন করা হয়েছে মূলতঃ রাস্তাঘাট ও দালান-কোঠার। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম শ্রেণীর ৪০% আবাদী জমি জলমগ্ন করে কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলেও এই বিদ্যুতের সুফল পাহাড়ীদের ভাগ্যে জুটেনি। এশিয়ার বৃহত্তম কাগজের কল চন্দ্রঘোনাস্থ কর্ণফুলী কাগজের কল পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত হলেও এতে পাহাড়ীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়নি। বনায়নের নামে লক্ষ লক্ষ একর ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের গণ-মানুষ এই ভূমির মালিকানা ও বনায়নের সুফল পায়নি।

এসব উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলে তালিকা শেষ করা যাবে না। তবে মোদ্দা কথা হচ্ছে - এসব উন্নয়নের ফলে পাহাড়ের গণ-মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই তথাকথিত উন্নয়নের ফলে সরকারী আমলা ও এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী দুর্নীতিগ্রস্থ মুষ্ঠিমেয় লোকের পকেট ভারী হয়েছে। এইসব উন্নয়ন পরিকল্পনা এই অঞ্চলের অধিবাসীগণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করা হয়নি। এইসব উন্নয়নে পাহাড়ের সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্ব ছিল অনুপস্থিত। এইসব উন্নয়ন এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মতামত, আশা-আকাংখা ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হয়নি; উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলতঃ এই উন্নয়নের সুফল যেমন সুবিধাভোগীদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করলেও তেমনি পাহাড়ী আদিবাসীদেরকে চরম দারিদ্রের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাদেরকে ঠেলে করা হয়েছে নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ। সম্প্রতি বনায়নের জন্য ২ লাখ ১৮ হাজার ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে শত শত পাহাড়ী মানুষের নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের প্রকৃত ধরণ। আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন কার্য তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের বিশেষ অবস্থাকে বিবেচনা করে অঞ্চলের সুষম উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে এবং এতে ক্ষতির পরিবর্তে পাহাড়ী গণ-মানুষের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করতে পারবে। সর্বোপরি উন্নয়নে আদিবাসী পাহাড়ীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে বলে মনে করা যেতে পারে।

আঞ্চলিক পরিষদের আরেকটা অন্যতম ভূমিকা হলো - পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন। সরকার যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে তাহলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া প্রণীত আইন পরিবর্তন ও নতুন আইন প্রণয়নে আঞ্চলিক পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন বা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবে। অতীতের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকার বরাবরই পার্বত্যবাসীর মতামত না নিয়েই একতরফাভাবে আইন প্রণয়ন করে এসেছে এবং প্রণীত আইন ইচ্ছামত সংশোধন করে এসেছে। ফলতঃ এইসব আইন প্রণয়ন ও সংশোধনী বরাবরই পার্বত্যবাসীর স্বার্থ ও অস্তিত্বকে ক্ষুন্ন করেছে। শাসকগোষ্ঠীর এই অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বেচ্ছাচারিতা আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে রোধ করা যেতে পারে এবং পার্বত্যবাসীর স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে গণ-মানুষের স্বার্থ রক্ষায় অবদান রাখতে পারবে বলে প্রতীয়মান হয়।

আরেকটা বিষয় এখানে আলোচনা করা দরকার। তা হলো - তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান প্রসঙ্গ। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুই স্তর বিশিষ্ট বলা যেতে পারে। প্রথম স্তর জেলা পরিষদ ও দ্বিতীয় স্তর আঞ্চলিক পরিষদ। কাজেই এই জেলা পরিষদসমূহের সাথে যদি আঞ্চলিক পরিষদের উত্তম সঙ্গতি ঘটে তাহলে অবশ্যই আদিবাসী পাহাড়ী তথা গণ-মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে। অন্যথায় নয়। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সম্ভাবনাটা অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে এই অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের জন্য আদিবাসী গণ-মানুষের স্বার্থে কাজ করার কিংবা কথা বলার অনেক সুযোগ ও ক্ষেত্র রয়েছে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। কারণ এই আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবার সাথে সাথে সব চাইতে জটিল ও বিড়ম্বনাপূর্ণ ভূমি সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্র যেমনি রয়েছে তেমনি রয়েছে বিগত সংঘাতময় পরিস্থিতি চলাকালে আদিবাসী পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে রুজুকৃত মামলা প্রত্যাহার, ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান, প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া/কার্যক্রম যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করার সুযোগ।

সর্বোপরি, পাহাড়ী গণ-মানুষের উপর যে অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হতো, জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে দুর্নীতিবাজদের দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা এবং অন্যায়-অবিচারের যে ষ্টীম রোলার চালানো হতো তা থেকে রক্ষা করার মতো দুরুহ কাজ চালাবারও সুযোগ থাকবে। আপততঃ পাহাড়ী জনগণের জীবনে সব চাইতে জোরালো যে সমস্যা তা হচ্ছে হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার। এই কাজ সফলভাবে করতে পারলে কমপক্ষে শতকরা ৯০ জন পাহাড়ী মানুষ উপকৃত হবে। আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের যথাযথ পুনর্বাসন হলে তাতেও কমপক্ষে শতকরা ৯০ জন পাহাড়ী মানুষ উপকৃত হবে। ৯০ শতাংশ পাহাড়ী উপকৃত হবার কথা এজন্যই বলছি যে, পাহাড়ীদের এমন কোন পরিবার নেই যারা কোন না কোনভাবে মোটেও উদ্বাস্তু হতে হয়নি।

চাকুরীর ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও পরিষদীয় অফিসে শুণ্যপদগুলোতে চুক্তি অনুযায়ী

জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে বেকার সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হয়ে যাবে। এইসব কাজ আপাততঃ আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কার্যকর হতে পারলে পাহাড়ের গণ-মানুষের স্বার্থ যে হাসিল করতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ ছাড়াও সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেহেতু এই আঞ্চলিক পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করার করার ক্ষমতা রয়েছে সেহেতু সহজ সরল পাহাড়ী জনগণকে মিথ্যা মামলার হয়রানি থেকে রক্ষা করতে পারবে। অতীত দিন থেকে আজ অবধি অধিকাংশ আদিবাসী পাহাড়ী এই মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আসছে।

যাহোক ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি আর আজকের আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। অতীতের শাসনবিধি ছিল সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, উপনিবেশিক ও সম্পূর্ণ আমলা-নির্ভর এবং সেখানে সাধারণ জনগণের কোন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বা অংশঅীদারীত্ব ছিল না। আর তার তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব ছিল ভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকের হাতে। কিন্তু আজকের আঞ্চলিক পরিষদ হচ্ছে গণতান্ত্রিক এবং আমলা-নির্ভর না হয়ে জনপ্রতিনিধি-নির্ভর এবং এর মূল্য, দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা থাকবে সম্পূর্ণ জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের উপর। সর্বোপরি আজকের আঞ্চলিক পরিষদ অর্জনের ক্ষেত্রে মূল্য দিতে হয়েছে সরাসরি পাহাড়ী গণ-মানুষকে; আর তার মূল্য ছিল দীর্ঘ পঁচিশ বছরের রক্তঝরা সংঘাতময় ইতিহাস।

চুক্তি সম্পাদনের সময় জনসংহতি সমিতি স্থানীয় সরকার পরিষদের বেশ কিছু ধারা-উপধারার সংশোধনী এনেছে। তার মধ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের সার্টিফিকেট প্রদান করবে ডেপুটি কমিশনারের পরিবর্তে সার্কেল চীফ। অনুরূপভাবে পরিষদের উপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছে। কতিপয় ধারা সংশোধন করে জেলা পরিষদকে আরো বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন করা হয়েছে। সরকার ইচ্ছে করলে এই পরিষদের ক্ষমতা প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন আমলার হাতে ন্যস্ত করার যে বিধান ছিল জনসংহতি সমিতি তা সম্পূর্ণ বাতিল করেছে।

কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদিত হলেও সরকার জেলা পরিষদসমূহ এমনভাবে পুনর্গঠন করে নিয়েছে যাতে ক্ষমতাসীন দলের একচেটিয়া কর্তৃত্বই বজায় থাকে। এই অবস্থায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের এই কর্তৃত্ব পরায়ণ কৌশলের সাথে নব গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে থাকার সম্ভাবনা খুবই প্রকট।

যাহোক, পরিশেষে আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি তা হলো - জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণটাই মূল ব্যাপার নয়। মূল বিষয় হচ্ছে চুক্তির যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন। চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের যে গড়িমসি ও ধীরে চলো নীতি অনুসরণ করে চলেছে সে বিষয়ে সরকার নীতিনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিচ্ছে কিনা সেটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী বিষয়। সরকার যদি চুক্তি বাস্তবায়নে সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে না আসে, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধন ও চুক্তির অন্যান্য বিষয় সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়নে সরকার যদি সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে জনসংহতি সমিতির দায়িত্ব গ্রহণও অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ সভাপতি মহোদয়কে।

* এই প্রবন্ধটা ১৯৯৮ইং ডেভলাপমেন্ট এন্ড কালেকটিভ কর্তৃক ঢাকাস্থ সিরডাপ-এ আয়োজিত সেমিনারে পঠিত হয়। সেসময় তখনো জনসংহতি সমিতি কর্তৃক কতিপয় যৌক্তিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেনি। প্রবন্ধে বিগত আওয়ামী সরকারের যে দলীয়করণ দৃষ্টিভঙ্গি ও যথাযথভাবে চুক্তি বাস্তবায়নে উদাসীনতা লক্ষ্য করে আঞ্চলিক পরিষদ পাহাড়ে গণ-মানুষের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে ইতবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা যে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে তা বিগত সময়ে প্রমাণিত হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নে অসদিচ্ছা ও চুক্তি পরিপন্থি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এখনো পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদ আশানুরূপ উল্লেখ্যযোগ্য কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ দলীয়করণ ও পরিষদে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য থাকার কারণে তিন পরিষদের সাথে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে যেমনি উত্তম সমন্বয় গড়ে উঠেনি তেমনি পার্বত্যাঞ্চলের গণ-মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও রয়ে গেছে সুদূর পরাহত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্যাঞ্চলের ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পার্বত্য জেলা পরিষদে অহস্তান্তরিত বিষয়সমূহ হস্তান্তর, বিশেষতঃ পুলিশ, ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি জরুরী বিষয়সমূহ হস্তান্তর, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল শুণ্যপদগুলোতে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ, চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের সনদপত্র প্রদান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জটিলতা নিরসন, তিন পার্বত্য জেলায় আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে মিশ্র পুলিশবাহিনী গঠন, খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি থানার পাকুজ্যাছড়িতে সম্প্রসারিত সেটেলার গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন ইত্যাদি প্রস্তাবসহ চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে সকল বিষয় সরকারের নিকট তুলে ধরা হয়েছে সরকার কোনটা বাস্তবায়ন করেনি। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা ও কার্যপ্রণালী প্রবিধানমালাও টেবিলের উপর ফেলে রেখে দেয় সরকার।

উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল জেলাগুলো থেকে আসা সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রচন্ডভাবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য থাকায় আঞ্চলিক পরিষদকে নানাভাবে অবজ্ঞা করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সরকারের নিকট আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে বার বার অভিযোগ উত্থাপন করা হলেও সরকারের তরফ থেকে তেমন কোন জোরালো প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে আমলাদের মধ্যে আরও চরমভাবে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রতিফলন ঘটে। এমনকি আঞ্চলিক পরিষদের নির্দেশকে অমান্য করে ও চুক্তিকে লঙ্ঘন করে ভূমি বন্দোবস্ত ও ইজারা প্রদানের নজিরও দেখা যায়। তাই পরিশেষে একথা বলা যায় যে, পাহাড়ে গণ-মানুষের স্বার্থ রক্ষায় আঞ্চলিক পরিষদ তখনি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে।

◆

স্মৃতিচারণ

স্মৃতির পাতা থেকে

সত্যবীর দেওয়ান

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সাল সকাল সাড়ে ছয়টা। রেডিওতে বিবিসি'র সংবাদ শিরোনামের প্রথম পর্যায়ে পরিবেশিত হলো - 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানে স্বপরিবারে নিহত হয়েছেন।' সেদিন নান্যাচরের বাড়ীতে বসেই সংবাদ শুনছিলাম। অপ্রত্যাশিত সংবাদে সকলের মন তখন রেডিওর দিকে আকৃষ্ট হলো। আমরা দেবাশীষবাবু ও দেবংশীবাবুসহ বৈঠকখানায় সকালের নাস্তা করছিলাম। এই সংবাদ শুনে সকলেই চুপচাপ এবং অনেকটা স্তম্ভিত। রেডিও ছেড়ে আর কোথাও যেতে তখন মন চাইছিল না। চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে সবাই পড়ে গেলাম।

ওদিকে তখন মা দুপুরের খাবার তৈরীতে ব্যস্ত। বিবিসি'র সংবাদের পর আকাশবাণীর সংবাদ। তারপর বাংলাদেশের সংবাদে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে পরিবেশিত হলো অন্য ধারায়। প্রচারিত হলো - 'একদলীয় স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটানো হয়েছে বিপ্লবের মাধ্যমে। গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য খোন্দকার মোস্তাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন'। 'বিপ্লব' শব্দের রাজনৈতিক অপব্যবহার কিভাবে করতে হয় এবং কিভাবে নকল করা যায়, তার দৃষ্টান্ত খোন্দকার মোস্তাক দেখালেন জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেয়ার মাধ্যমে। রেডিও অন রাখা হলো সারাক্ষণ। ৯টার সংবাদও শেষ হলো। আমরা এই 'অভ্যুত্থান'কে পর্যালোচনা করছিলাম।

এমনি মূহুর্তে হঠাৎ বাড়ীর কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো। তাৎক্ষনিক আমি উঠে উঠানের দিকে নেমে দেখলাম কেউ আসছে কিনা। বাড়ীর প্রধান রাস্তার মুখে এসে দেখলাম আমাদেরই নেতা এম এন লারমা তার অপর একজন সহযোদ্ধা নিরু'কে নিয়ে এক সাথে আসছেন আমাদের দিকে। নিরুর হাতে ছিল নেতার লাইসেন্স করা পয়েন্ট ২২ রাইফেল। তাঁদের অপ্রত্যাশিত আগমনে আমরা বৈঠকখানা হতে সবাই উঠে পড়লাম। তাঁরা আসার সাথে সাথে আমরা একে একে করমর্দন করার পর বৈঠকখানায় সবাই বসে পড়লাম। পরক্ষণে আমি রান্নাঘরে গিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে গেলাম। আর মা'কে এম এন লারমার আসার সংবাদ জানালাম। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে মা অত্যন্ত আগ্রহভরে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। মা আসার সাথে সাথে এম এন লারমা (মঞ্জুবাবু) উঠে মাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করলেন এবং কুশলাদি বিনিময় করলেন।

মা তাঁদের বসার কথা বলে, কাগজী লেবুর শরবত তৈরীর ব্যবস্থা করলেন। আর কাগজী লেবুর শরবত পান করতে করতে আমাদের মধ্যে আলাপ শুরু হলো। আলাপ চলছে সেদিনের দেশের রাজধানীতে সামরিক অভ্যুত্থানের কথা। আমি এদিকে অপ্রত্যাশিত আগমনের কারণ জানতে চেয়ে তিনি বললেন, 'আমরা মহালছড়ির উদ্দেশ্যে রিজার্ভ বাজার লঞ্চ ঘাটে আসা মাত্র বিবিসি'র খবরে জানতে পারি ঢাকার সামরিক অভ্যুত্থানের কথা।' কি হতে কি হয় - চিন্তা-ভাবনা করে সরাসরি মহালছড়ি না গিয়ে নানিয়ারচরে নামলাম - যাতে তোমাদের সাথে (আমাকে উদ্দেশ্য করে) সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যেতে পারি।'

তিনি পুনরায় বলেন, 'কি আশ্চয্য! মাত্র কয়দিন আগে শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরেছি! এরই মধ্যে এতবড় হত্যাকান্ড! ভাবতে অবাক লাগছে। বাঙালী প্রতিক্রিয়াশীলরা শেখ সাহেবকে বাঁচতে দিলো না। কি নির্মম নৃশংস হত্যাকান্ড! একমাত্র উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধরাই এরূপ হত্যাকান্ড ঘটাতে পারে।' তিনি আবারও বললেন, 'এই হত্যাকান্ডের অন্তরালে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত থাকতে পারে। এর পরিণতি সুদুর প্রসারী হবে বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে।' তিনি আরও বললেন, 'এখন কথা হচ্ছে যারা ক্ষমতা দখল করলো তারা কে? কার স্বার্থে তারা এ কাজ করলো? এর নেপথ্যে কে রয়েছে তা আমাদের জেনে নিতে হবে। এর উপরই নির্ভর করবে আমরা নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কতটুকু আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবো?' কিছুক্ষণ নিরব। এরই মধ্যে মা সকলের ভাতের ব্যবস্থা করার কথা বলতে এলেন। কিন্তু না, তিনি বললেন, 'আমাদের ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে না, আমাদের ভাত সাবেক্ষ্যং চেয়ারম্যানের বাড়ীতে হবে' এই বলে মানা করে দিলেন।

তারপর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমার কাজ হবে এখন ১নং সেক্টরে গিয়ে রাঙ্গামাটির সার্বিক পরিস্থিতি জেনে নিয়ে কেন্দ্রে বিস্তারিত অবহিত করা, তাতে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমান্ডারদের সহযোগিতা নেয়া।' আর দেবাশীষবাবু ও দেবংশীবাবুকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা আমাদের সাথে চলো, সেখানে গিয়ে কথা হবে।' যেই কথা সেই কাজ। আমাদের বাড়ী হতে মাসহ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা চলে গেলেন।

আর আমি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে নেতার নির্দেশ অনুসারে রওনা হলাম সাপমারায়। সেখানে গণসংযোগ কেন্দ্রের সাহায্যে নৌকা যোগে ১নং সেক্টরের অন্তর্গত তৎকালীন বি জোনের দিকে চললাম। নৌকায় করে বসে তখন নানা জল্পনা কল্পনার শেষ নেই আমার। এম এন লারমা কর্তৃক বাংলাদেশের সামরিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে মূল্যায়ন ও মন্তব্য এবং সর্বোপরি শেখ সাহেবের মৃত্যুতে তাঁর হৃদয়ে শোকের গভীর বেদনা ফুটে উঠেছে (আমি যা দেখতে পেয়েছি) এতে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছি।

জুম্ম জনগণসহ এখানকার স্থায়ী অধিবাসী বাঙালী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এম এন লারমা যখন আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্বশাসন দাবী করেন, তখন দেশের তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান দম্ভ ভয়ে বলেছেন, 'লারমা তুমি বাড়াবাড়ি করো না, বাড়াবাড়ি করলে ১, ২, ৩, ...১০ লাখ বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকিয়ে দেবে।' এরূপ হুমকি যিনি লারমাকে দিয়েছেন, তার মৃত্যুতে লার্মার শোকাহত হবার ঘটনা দেখে আমি হতবাক। এখানেই তাঁর মহান হৃদয়ের সন্ধান মিলে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবিতবস্থায় এম এন লার্মাকে যা হুমকি দিয়েছেন, তা পরবর্তীতে সামরিক শাসক ও বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান বাস্তবায়ন করে গেছেন। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অদিবাসীদের কাছে মুজিব ও জিয়ার কোন পার্থক্য নেই।

যা হোক, নানা চিন্তা ভাবনা করতে করতে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। আর তৎকালীন সংশ্লিষ্ট বি জোনের কমান্ডারের মাধ্যমে ১নং

সেক্টরের সহযোগিতায় রাঙ্গামাটির নিকটবর্তী পুটিখালী গিয়ে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় রাঙ্গামাটিতে যোগাযোগ করে যাবতীয় সংবাদপত্র সংগ্রহসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে অবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন ইত্যাদি জেনে নেয়ার পর পুনরায় আমার কর্মস্থলে ফিরে আসি। তারপর বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরী করে পেপার কাটিংসহ কেন্দ্রে প্রেরণ করি।

এরপর কিছুদিন অতিবাহিত হলো। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঢাকা থেকে তৎকালীন আওয়ামী লীগেরই এক নেতা যিনি খোন্দকার মোস্তাকের সঙ্গে ছিলেন তাহের উদ্দিন ঠাকুরসহ অপর নেতা রাঙ্গামাটি ঘুরে যান এবং তৎকালীন এম এন লারমার খোঁজ করে ঢাকায় ফিরে যান। এরপরে জানা যায় তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর হতে এম এন লারমাকে সরাসরি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ হতে সরে আসতে হয়েছে। তিনি অবশ্যই বিভিন্ন বন্ধুর মাধ্যমে আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক পথে করা যাবে কিনা এবং বাইরে আসার কোন পন্থা আসে কিনা তলব করেছেন। জেএসএস'কে বেআইনী ঘোষণা করার সাথে সাথেই এম এন লারমা'কে গ্রেপ্তার করারও নিদের্শ রয়েছে বলে জানা যায়। ফলে এম এন লারমকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হতে অনিয়মতান্ত্রিক সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়।

এম এন লারমার দুরদর্শীতা ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

এম এন লারমার রাজনৈতিক দুরদর্শীতা ও গভীর রাজনৈতিক প্র'া ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হতেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি তৎকালীন বাংলাদেশ সংসদে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বাংলাদেশের একজন নাগরিকের জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সংসদে তখন বাংলাদেশের জাতীয়তা 'বাঙালী' বলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ হয়ে যায়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যে ভুল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করে নিলেও তার পরিণতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে প্রভাব পড়েছে তাতে একটি দেশের একজন নাগরিকের জাতীয়তা আর জাতিসত্ত্বার পরিচয় যে এক জিনিষ নয় তা আজ প্রমাণিত।

তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনায় তখন উগ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্ন থাকার কারণে বাংলাদেশের নাগরিকের জাতীয় পরিচয় বা জাতীয়তা সেদিন জাতীয় সংসদে 'বাঙালী' হিসাবে গৃহীত হয়। এম এন লারমা তার প্রতিবাদে সংসদে ওয়াক আউট করেন। আর বাংলাদেশের জাতীয়তা একমাত্র 'বাংলাদেশী'ই হতে পারে, 'বাঙালী' হতে পারে না তা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহই প্রমাণ করেছে। 'বাঙালী' একটি জাতিসত্ত্বা, তা জাতীয়তা হতে পারে না। ইহা বিভিন্ন দেশের জাতীয়তা বা জাতীয় পরিচয় যেভাবে নির্ধারিত হয় তা বিচার বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে এই অ'লের পাহাড়ী বাঙালীর পরিচয় ছিল 'পাকিস্তানী'। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে 'পাকিস্তানী' নামে কোন স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা ছিল না। তেমনি আমাদের পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের অধিবাসীদের জাতীয় পরিচয় 'ভারতীয়'। কিন্তু ভারত নাম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ভারতীয় নামে কোন স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা নেই। যদিও সেখানে বহু জাতিসত্ত্বার অবস্থান রয়েছে। তৎপরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়া 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' এর প্রবর্তন ঘটান।

বস্তুতঃ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা ও উদ্ভাবক এম এন লারমা তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা সংসদে তুলে ধরেন। কিন্তু জেনারেল জিয়ার প্রবর্তিত 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ও এম এন লারমার উদ্ভাবিত 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এম এন লারমার 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ধর্মনিরপেক্ষতা, বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জাতিসমূহের সমঅধিকার ও সর্বোপরি গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু জেনারলে জিয়ার প্রবর্তিত 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'এর মূল ভিত্তি হচ্ছে উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ ও উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ। তাই দেখা যায় সংবিধান সংশোধন করে দেশে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' প্রবর্তন করা হলেও জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে রূপান্তরিত করার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম আরো প্রকট আকার ধারণ জেনারেল জিয়ার আমলেই। ৪ (চার) লক্ষাধিক বহিরাগত সেটেলার পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটানোর মাধ্যমে এই কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হতে থাকে।

বাংলাদেশের জাতীয় মূল স্রোতধারা উগ্র জাতীয়তাবাদ ও উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন

১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃত্ব কেবল যে সামজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধন করে জনসাধারণকে ধর্মের বন্ধন হতে মুক্ত করে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের ব্যাপারে একেবারে নিশেষ্ট ছিল, তাহাই নহে, পক্ষান্তরে জাতীয় নেতৃত্ব উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শকে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ধর্মকে জাতীয় মূল স্রোতধারার সাথে যুক্ত করে। ফলে বাংলাদেশের জাতীয় মূল স্রোতধারা বাঙালী উগ্রজাতীয়তাবাদ ও উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের প্রভাবে মহোচ্ছান্ন হয়ে পরে। দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন। উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যেতে থাকে। ফলে অমুসলমান ও অবাঙালী জনতার মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রধানতঃ তাই এদেশের অবাঙালী ও অমুসলমান জনতাকে এদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জাতীয় মূল স্রোতধারা থেকে দুরে সরিয়ে রাখার জন্য দায়ী। তাই এই জাতীয় মূল স্রোতধারার ধারাবাহিকতা হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত গতিতে ১৯৭৯ সনে প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসন আমলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পাহাড়ীদের উচ্ছেদ করে ৪ লক্ষাধিক সেটেলারকে অবৈধভাবে পুনর্বাসন করা হয়। তেমনি এদেশের বিভিন্ন জেলার অন্তর্গত সংখ্যালুঘুদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক ঘটনাবলীর সূত্রপাত হয়ে থাকে। এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সম্প্রসারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রে থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত জাতীয় নেতৃত্বে ও জাতীয় মূল স্রোতধারা উগ্র ধর্মান্ধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মোহে মোহাচ্ছন্ন থাকবে ততদিন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ও স্থায়ী বাসিন্দা জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও বাস্তবায়ন হতে পারে না এবং বাংলাদেশের সংখ্যালুঘুদের উপর নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধ হতে পারে না। এটাই বাস্তবতা। তাই বাংলাদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শাক্তিকে শাসকগোষ্ঠীর ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার কাজে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে এগিয়ে আসতে হবে।

◆

স্মৃতিচারণ

মহান নেতা এম এন লারমার আত্মসংযম

অমিয় প্রসাদ চাকমা

"আচ্ছা রমানাথ, স্যার তাঁর বিছানায় বসে বসে কি করেন?" আমরা হোস্টেলের ছাত্র বন্ধুরা মিলে একই সাথে সমস্বরে জিজ্ঞেস করতাম। শ্রী রমানাথ বড়ুয়া আমাদের ছাত্র জীবনে স্কুলের দপ্তরী এবং একই সাথে স্যারদের বাবুর্চির কাজটাও করতো। তখন আমি নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র। এসময়ে আমাদের বাংলা পাঠ্য বইয়ের গদ্যাংশের সিলেবাসে সৈয়দ মুজতবা আলীর "দেশে বিদেশে" গ্রন্থখানি থেকে "পাঠানমুল্লুকে" নামক একটা অংশ ছিল। ওখানে লেখক যখন পর্যটক হিসেবে কাবুল বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন যেখানে তিনি উঠেছিলেন সেখানে আব্দুর রহমান নামে এক বাবুর্চিকে নাগাল পেয়েছিলেন। বেশ কিছুদন থাকার পর তার সাথে একটু ভাব করে মাঝে মধ্যে গল্পগুজব করতে করতে একদিন ঐ বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "সে বাড়ীতে যাবে কি-না, কতদিন হলো বাড়ী যাচ্ছে না, ছেলেপুলে কয়জন ..... ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সর্বশেষে সে ঐখানে বসে বসে কি করে?" উত্তরে আব্দুর রহমান বলতো দেশে তার বাবা-মা আছে, তার ছেলেমেয়ে দু'জন, অনেক দিন হলো বাড়ী যাচ্ছে না, আগামী ঈদের সময় বাড়ী যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের ছাত্র বন্ধুদের প্রশ্নেও শ্রী রমানাথ বড়ুয়া আব্দুর রহমানের মতোই জবাব দিতো- " স্যার তাঁর বিছানায় রুমে বসে বড়ই ব্যস্ত থাকেন, বই পড়েন, মাঝে মাঝে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর কিছু একটা লিখতে থাকেন।" প্রায় সময় উত্তরটা এভাবে আসতো। খ্যাতনামা উপরোক্ত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর মতোই দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর সৌভাগ্য তো আমার জীবনে কখনো হয়নি। কিন্তু আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা চিন্তা করে "দেশে বিদেশে" গ্রন্থখানির লেখকের কথা যেমনি মনে মনে চিন্তা করলাম তেমনি স্মৃতির মানসপটে মহান নেতা জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, জুম্ম জাতীয় চেতনার চিন্তানায়ক, মহানুভব এমএন লারমাকে স্মরণ করে তখনকার ছাত্র জীবনের দপ্তরী শ্রী রমানাথ বড়ুয়াকে করা প্রশ্নটির কথা স্মরণ হলো- যেমনিভাবে সৈয়দ মুজতবা আলী আব্দুর রহমান নামের বাবুর্চিকে খেয়ালবশতঃ প্রশ্ন করেছিলেন।

উত্তরে - "বই পড়তেন ও মাঝে মধ্যে কিছু একটা লিখতেন"। সত্যি কোন কিছু বিষয়ে ধীরে আস্তে অগ্রসর হয়ে সংযতভাবে কিছু করার এবং চিত্তকে দমন করে সহনশীণলতার সাথে কাজ করাটাই হলো ধৈর্য্য এবং কোন কিছু বিষয়ে সহজে কার্যকরী ব্যবস্থা না নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাটাই হলো সংযম প্রদর্শন করা। আর সংযম যিনি আত্মচিত্তে ধারণ করতে পারবেন তিনি আত্মসংযমী। আত্মসংযম হলো মহাপুরুষদের অন্যতম একটা প্রধান গুণ। একজন ধ্যানী যেমন তার লক্ষ্য অর্জনে দৃপ্ত ও দৃঢ় পদে আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে যান, নীরবে নিভৃতে ধ্যান সাধনায় নিবৃত্ত থাকেন তেমনি ছাত্র জীবনে ফেলে আসা পোড় খাওয়া জীবন ও সাথী বন্ধুদের কথা চিন্তা করে স্যারও তার ঐ শোবার রুমে বিছানায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। আত্মপ্রত্যয়ে বলিয়ান, দৃঢ়চেতা, বিপ্লবী, দূরদর্শী, চিন্তানায়ক, আত্মদর্শনে অটল থেকে চিন্তা করেছিলেন যে, কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে এবং কি করলে মুক্তি লাভ করা যাবে - এ প্রশ্নটি নিয়ে। কারণ ছাত্র জীবনে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদ জানিয়ে যে ২৬ মাস জেল খেটেছিলেন তাতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজেরই প্রচেষ্টাই সহযোদ্ধা গড়ে তোলে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে - এতে কোন সন্দেহ নেই, এই সিদ্ধান্তে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন। তাই একজন ধ্যানীর মতো তাঁর শিক্ষকতার জীবনে জীবন চলার পথে সংযমী হয়ে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন।

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে প্রচারপত্র ছাপিয়ে ২৬ মাস চার দেয়াল ঘেরায় অন্তরীন থাকার পর প্রথমেই দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং ধ্যানীর মতোই জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে শাসন-শোষণ ও বঞ্চণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। বাসা থেকে বের হতে খুব কমই দেখা যেত। শুধুমাত্র স্নানের সময়ে একটুখানি দেখা যেত মাইনী নদীর ঘাটে। আর দেখা যেত পেশাগত কাজে আসতে, বিদ্যালয়ে খেলার মাঠে স্কুলে আসার পথে। তখন আমরা মনে মনে বারে বারে ভাবতাম, স্যার এত সময় নিজের কামরায় চুপটি মেরে কি করেন? আজ ৩৪ বছর পর আমার সম্যক দৃষ্টিতে চিন্তা করে তবেই উত্তর খুঁজে দেখছি যে আত্মসংযম চর্চায় ওভাবে বসে বসে অথবা একটু বিছানায় হেলান দিয়ে হলেও বই পড়ে গভীর চিন্তাভাবনায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন তিনি। বাইরে থেকে কোন প্রয়োজনে কেউ অথবা কোন শিক্ষক আসলে কথাবার্তা বলার পর বারান্দায় কাজ সেরে বিদায় দিতেন। কি অপূর্ব মোহনীয় হাস্যোজ্জ্বল মুখ! স্মিতহাস্য, স্বল্প অথচ মিষ্টভাষী কি মায়াময় সম্মোহনী শক্তি। কেউ দেখলে আপনাতেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগে। তাঁর কথা ও ব্যবহারিক মাধুর্যে যে কোন ব্যক্তি বিমোহিত না হয়ে পারেন না। তাঁর কথা বা উপদেশানুসারে কাজ করতেন সবাই।

১৯৬৫ সালে শিক্ষকতা কাজে যোগদানের পর ১৯৬৮ইং পর্যন্ত একটানা ৪ বছরে বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যালয় এলাকা, বিশেষ করে বাসা (থাকার ঘর) ছাড়া কোথাও যেতে খুব কম দেখেছি। আমি দেখেছি এক সহকর্মী বন্ধুর পিতৃবিয়োগে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাতে, বার্ষিক পরীক্ষা শেষে বিদ্যালয়ের এক ছাত্র অভিভাবকের বিশেষ আহ্বানে ও সেই সাথে বর্তমান দীঘিনালা ক্যান্টনম্যান্ট এলাকায় তৎকালীন গরীব মানুষের বন্ধু প্রভাবশালী প্রহলাদ কার্বারী নামের এক বৃদ্ধকে স্বশরীরে দেখার আগ্রহে এবং ১৯৬৬ সালের তৎকালীন আয়ুব শাহীর অর্থাৎ পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক প্রেসিডেন্টের মৌলিক গণতন্ত্র বহির্ভূত জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী নিহার বিন্দু চাকমার পুরোনো বাজারের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাড়া আর কোথাও যেতে দেখিনি। বিদ্যালয় এলাকার বাইরে ১৯৬৭ সালে ময়মনসিংহে বিএড ট্রেনিং এবং সেখান থেকে ফিরে ১৯৬৮ সালে রামগড়ে আমাদের পরবর্তী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় নেয়া ছাড়া আর কোথাও এই সুদীর্ঘ ৪ বছরে গেছেন বলে আমার জানা নেই। ঐ বছরের শেষ সময়ে দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয় হতে একেবারে বিদায় নিয়ে চট্টগ্রামে এলএলবি পড়তে যান। জীবন সাধনায় এত ধ্যানী, ধৈর্যশীল, আত্মসংযমী বীর পুরুষকে দেখার সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়েছে?

নিজের জীবনকে এমনভাবে সংযত রাখতেন ধুমপান বলতে কি জিনিষ, তাতে স্বাদ না বিস্বাদ জানতেন না। জীবন দর্শনে তিনি এমনই সংযমী যে তাঁর পোষাক পরিচ্ছদেও তা প্রকাশ পেত। শিক্ষকতা জীবনে তাঁর মাত্র দুটো সাদা প্যান্ট আর দুটো গাঢ় আকাশী ময়না রঙের শার্ট, একজোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল, একজোড়া কালো চামড়ার জুতা, একটা ব্যাগ ও একটা বেডিং ছাড়া আর কিছুই ছিল না। লুঙ্গি গামছা শুধু স্নানের সময়ই ব্যবহার করতেন। কোনদিন লুঙ্গি পরে বাসার বাইরে যেতে দেখিনি। টাকা পয়সা খরচ করে বাজার থেকে কিছু কিনতে জীবনে দেখিনি। শ্রী রমানাথ বড়ুয়াকে দিয়ে খরচপত্রাদি করাতেন। মাইনী নদীতে নিজেই কাপড়-চোপড় ধোতেন এবং ঐ বুড়ো দপ্তরী শ্রী রমানাথ বড়ুয়াকে দিয়ে ধোপার কাছে ইস্ত্রি করাতেন।

যতদিন পৃথিবীর বুকে এ জুম্ম জাতি বেঁচে থাকবে মহান নেতা, জুম্ম জাতীয় মুক্তির পথ প্রদর্শক, ত্যাগী, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী, সংযমী মহাপুরুষ এম এন লারমাও ততদিন উজ্জ্বল চন্দ্র- সূর্য্যের মতই অক্ষয়, অমর হয়ে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

◆

স্মৃতিচারণ

ধুদুকছড়া আজো স্মৃতিতে অম্লান

মথুরা লাল চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের চারিদিকে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কেউ বাইরে যান না। ঘন্টা মিনিট হিসেব করে পথ চলতে হয়। কখন কি বিপদে পড়তে হয় ঠিক নেই। এমন সময়ে ১৯৯২ সালের ২৪ জানুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহবায়ক বাবু হংসধ্বজ চাকমার একখানা চিঠি পেলাম এবং হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়লাম। অশান্ত পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনার টেবিলে বসার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা থেকে আমাকে যোগাযোগ কমিটির সম্মানিত সদস্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ১৯৯২ সালের ২৬ জানুয়ারী বেলা ১০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে যোগাযোগ কমিটির মিটিংয়ে যোগদান করতে হবে।

সরকারী বাহিনীর অত্যাচার উৎপীড়নের ভয়ে যে সময় শান্তিবাহিনীর নাম পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করে না তাদের সাথে যোগাযোগ করে সরকারের সাথে আলোচনার টেবিলে বসার ব্যবস্থা করতে হবে। ভয়ে বুক কাঁপতে লাগলো। অন্যদিকে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে এনে দেশের মঙ্গলের জন্য আমাকে এত বড়ো দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তাতে গর্ভে বুক ভরে উঠলো। ২৫ জানুয়ারীর সুন্দর সকালে ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত অসুস্থ শরীরে রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম কোচে চড়ে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে আবার বাস বদল করতে হলো। সমস্ত রাস্তা অসুস্থ শরীরে বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন মতে খাগড়াছড়িতে হংসধ্বজ বাবুর বাসায় উপস্থিত হলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিশ্রামাগারে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। ইতিমধ্যে রামগড় থেকে অন্যতম সদস্য বাবু নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা এবং বাবু অনন্ত বিহারী খীসা, পানছড়ি থেকে জনাব মোঃ শফি এবং বান্দরবান থেকে বাবু কৈশ অং খাগড়াছড়িতে পৌঁছে গেছেন।

পরদিন ২৬ জানুয়ারী যথাসময়ে খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং বাবু হংসধ্বজ চাকমাকে আহবায়ক করে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি গঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের সদিচ্ছার কথা জানিয়ে প্রস্তাব নেয়া হয় এবং যোগাযোগ কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের কোথায় দেখা হবে এ সংবাদ নিয়ে ২ (দুই) জন বার্তাবাহক পাঠানো হল। এভাবে ২৯ জুলাই এবং ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ইং খাগড়াছড়িতে আরো দু'বার বৈঠক হয়।

এভাবে বহু পরীক্ষার পর ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ইং বাবু হংসধ্বজ চাকমার নেতৃত্বে যোগাযোগ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ পুজগাং-লোগাং হয়ে ধুদুকছড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে পথে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাতের ইশারায় প্রাণভরে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল। তারা হয়তো জানতে পারছে আমরা অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তির অন্বেষায় দূর্গম পথের যাত্রা করছি। বিকেল ৪ ঘটিকায় ধুদুকছড়ার বিডিআর ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সেখানের অধিনায়ক মেজর শওকত সাহেব আন্তরিকতার সহিত আমাদের অভিনন্দন জানালেন ও চা পানে আপ্যায়িত করলেন। সন্ধ্যায় গোধূলী লগ্নে ঝির ঝির বৃষ্টি ভেজা স্যাঁতস্যাতে পথে ধুদুকছড়ার পাড়ে মধু রঞ্জন কার্বারীর জীর্ণ কুটিরে রাত্রি যাপনের জন্য আশ্রয় নিলাম। সকালে দু'জন গাইড আমাদের শান্তিবাহিনীর আস্তানায় নেয়ার জন্য গভীর অরণ্যপথে যাত্রা শুরু হলো।

ধুদুকছড়ার পাড়ে পাড়ে একহাটু কাঁদা পানিতে আবার কোথাও লজ্জাবতীর কাঁটা বিধে পায়ের তলা যন্ত্রনায় টন টন করছিল। ক্লান্তিতে মনে মনে ভাবতে লাগলাম আরো কতদুর হাঁটতে হবে এভাবে শান্তির অন্বেষায়। কিছুক্ষণ পর অনতিদূরে টিলার উপরে পরিত্যক্ত একটি মাটির ঘর দেখা গেল। লিচু, আম, কাঁঠাল গাছে ভরা। নিশ্চয়ই আগে কোন লোকালয় ছিলো। এসময় আমাদের গাইড থমকে দাঁড়ালো এবং আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো ঐতো শান্তিবাহিনীর নেতা বাবু সুধাসিন্ধু খীসা ও বাবু উষাতন তালুকদার আমাদের অভিনন্দন জানানোর জন্য টিলার নীচে নেমে আসছেন। হাসিমুখে আমাদের সাথে আলিঙ্গন করে কুশল বিনিময় করলেন। এক নিমিষে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের খবর জানতে চাইলেন। চক চকে রাইফেল হাতে কয়েকজন পাহাড়া দিচ্ছিলেন চারিদিকে। জনসংহতি সমিতির পক্ষে বাবু উষাতন তালুকদার বক্তব্য রাখলেন। হংসধ্বজ বাবুর আহবানে সরকারের সাথে বৈঠকে বসার দিনক্ষণ ঠিক হলো বহু প্রতীক্ষিত সেই ৫ নভেম্বর ১৯৯২ইং খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে। তাই সেই শান্তির সূতিকাগার ধুদুকছড়া আমার স্মৃতিতে আজো অম্লান।

◆

যাদের আত্মবলিদান অনুপ্রেরণার উৎস

শহীদ নিখিল এক সাহসী যোদ্ধার নাম

লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা

'নিখিল' - জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে একটি সাহসী যোদ্ধার নাম। শহীদ নিখিলের আসল নাম মিতেশ দেওয়ান। শহীদ নিখিলের জন্ম রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি থানার এক প্রত্যন্ত গ্রামে - মিটিঙ্যাছড়িতে। অবশ্য বর্তমানে তার মা-বাবা'রা সেই গ্রাম ছেড়ে রাঙ্গামাটি শহরের দেবাশীষনগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। শহীদ নিখিলেরা নয় ভাই-বোন। ভাই-বোনদের মধ্যে অনুরূপা, পরেশ, নিরূপা, সুরূপা ও অনন্ত শহীদ নিখিলের বড় এবং অরূপা, ইতিরেখা ও সুপনা তার চেয়ে ছোট। বাবা শ্রী সুনীতি কুমার দেওয়ানের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টে। একজন দক্ষ ইলেক্ট্রিক্যাল অপারেটর হিসেবে তিনি দীর্ঘ কর্মময় জীবন পরিক্রম শেষে ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সৎ, নিষ্ঠাবান ও বিনয়ী ছিলেন বলে পেশাগত জীবনে সহকর্মী থেকে শুরু করে উর্ধতন কর্মকর্তা সকলের কাছে ছিলেন আপনজন। মা শ্রীমতি মীরাবতী দেওয়ান সাধারণ গৃহিনী। তিনি সমাজ সংসার দেখাশুনা এবং ছেলেমেয়েদের মানুষ করার প্রধান কান্ডারী ছিলেন। ছেলেমেয়েদের সবাইকে বড় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত না করতে পারলেও প্রকৃত মানবিক জ্ঞানে শিক্ষিত করেন।

আমার দৃষ্টিতে এই যোগ্যতা নিখিলের কর্মজীবনে কোন সময় থেমে থাকেনি। শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তার বিকাশের ধারা ছিল প্রবাহমান। তার রাজনৈতিক ও সামরিক মান উন্নত পর্যায়ে ছিল। প্রতিটি লড়াইয়ে সে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং তার সেকশনকে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়। পর্যায়ক্রমে লেন্স কর্পোরেল, কর্পোরেল ও সার্জেন্ট পদে তার পদোন্নতি হয়।

চাকমা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, "ভূইয়ের গুণে রোয়া, মায়ের গুণে পোয়া"। মমতাময়ী মা শ্রীমতি মীরাবতী দেওয়ানের সুস্থ ও সুন্দর সাংস্কৃতিক মনন প্রভাব তার প্রতিটি ছেলেমেয়ের মানসিক গড়ন প্রক্রিয়ায় অত্যাধিক গুরুত্ব ভূমিকা রাখে। তিনি চাকমা রাজ পরিবারের সংস্পর্শে থেকে বাল্যকাল থেকে বেড়ে গড়ে উঠেন। মা হারা সাত বছরের শিশু মীরাবতী ও দিদি ছোট ঠাকুরদার আশ্রয় পায়। ঠাকুর দা চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়ের দেহরক্ষীর দায়িত্বে ছিলেন বলে শিশু মীরাবতী রাজ পরিবারের প্রত্যেক সদস্য, বিশেষতঃ চাকমা রানী বিনিতা রায়ের স্নেহ ছায়ায় আশ্রয় পান। বিয়ের আগ পর্যন্ত (রাজা নলিনাক্ষ রায় ও রানী বিনিতা রায় তার বিয়ের সমস্ত দায়িত্ব নেন) তিনি রানী বিনিতা রায়ের ছায়ার মতো থেকেছেন। একদিকে চাকমা রাজ পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল অন্যদিকে বিশিষ্ট বাঙালী সংস্কৃতির ধারক-বাহক রানী বিনিতা রায় - এই দুই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে শ্রীমতি মীরাবতী নিজেকে একজন যোগ্য সহধর্মিনী ও আদর্শ মায়ের সৎ গুণাবলী অর্জন করেন। এই আদর্শ মায়ের সন্তান অনন্ত ও নিখিল দুজনেই জনসংহতি সমিতির সামরিক বিভাগে যোগ দেয়। অনন্ত ১৯৭৭ সনে প্রথমে যোগ দেয়। বছর দুয়েক কাজ করার পর ঘন ঘন জ্বরে ভোগার কারণে শান্তিবাহিনীতে নিয়মিত সদস্য হয়ে কাজ করা আর তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে সহযোগী হয়ে বিভিন্ন সময় সহযোগিতা দেয়।

অগ্রজ অনন্তের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭৮ সনে ১৬ বছর বয়সে শহীদ নিখিল সামরিক বিভাগের সদস্য হিসেবে যোগ দেয় ও শুরু হয় তার বিপ্লবী সশস্ত্রবাহিনীর দীর্ঘ কর্মময় জীবন। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় আন্দোলনে যোগ দেয়। রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সে তার যোগ্যতার পরিচয় প্রশিক্ষকের নিকট দিতে সমর্থ হয়। আমার দৃষ্টিতে এই যোগ্যতা নিখিলের কর্মজীবনে কোন সময় থেমে থাকেনি। শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তার বিকাশের ধারা ছিল প্রবাহমান। তার রাজনৈতিক ও সামরিক মান উন্নত পর্যায়ে ছিল। প্রতিটি লড়াইয়ে সে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং তার সেকশনকে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়। পর্যায়ক্রমে লেন্স কর্পোরেল, কর্পোরেল ও সার্জেন্ট পদে তার পদোন্নতি হয়। উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যায় সে।

বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের সৃষ্ট গৃহযুদ্ধে শহীদ নিখিল প্রথম থেকে অংশগ্রহণ করে। গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ বাহিনী ডিডিএফ-এর একটা ফাইটিং গ্রুপের দায়িত্ব লাভ করে এবং স্বাধীনভাবে দক্ষতার সাথে এই গ্রুপ পরিচালনা করে। গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১নং সেক্টর পুনর্দখল ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পেলেবাবু ও আমার নেতৃত্বে ডিডিএফ-এর অভিযান ১৯৮৫ সনের বিজুর দিন শুরু হয়। এই অভিযানেও শহীদ নিখিল অংশগ্রহণ করে। ১নং সেক্টর পুনর্দখল শেষ হওয়ার প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র ডব্লিউ জোন আমাদের দখলে/ নিয়ন্ত্রণে আসা বাকী ছিল। প্রথমে একজন লেফট্যান্টের নেতৃত্বে একটা ফাইটিং গ্রুপ (প্লাটুন) পাঠানো হয়। তারা ব্যর্থ হয় এবং অস্থায়ী এইচকিউ-তে ফিরে আসে। অস্ত্র ও জনশক্তি বৃদ্ধি করে দুই জন লেফট্যান্টের নেতৃত্বে আরো একটা ফাইটিং গ্রুপ পাঠানো হয়। তারাও সফলকাম হতে পারেনি। মূল রহস্য হচ্ছে - স্থানীয় লোক যারা এই গ্রুপ গাইডের কাজে নিয়োজিত ছিল তারা আসলে আর্মী জোনের ইনফরমার ছিল। তারা ডবল এজেন্ট হয়ে কাজ করতো। তারা ছলচাতুরী করে ফাইটিং গ্রুপকে ডব্লিউ জোন পুনর্দখলের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

করতো। ফলে আর্মীদের এ্যাম্বুশ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছিল না। এটা আমার জন্য খুবই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

একদিন পড়ন্ত বিকেলে শহীদ নিখিল অস্থায়ী কার্যালয়ে আমার সাথে দেখা করে এবং ডব্লিউ জোন পুনর্দখলের দায়িত্ব তাকে দেয়ার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব রাখে। আমি সম্মত হই এবং তাদের যাত্রার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির নির্দেশ দিই। সেই দিনের তারিখ আজ আর মনে নেই। সবকিছু একের পর এক স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠছে। যাত্রার প্রস্তুতি শেষ এবং যাত্রার আগে শহীদ নিখিল অফিসে এসে বিদায় নেওয়ার পূর্বমুহূর্তে আমাকে বলে, "স্যার, আপনি আমাদের জন্য দুঃশ্চিন্ত া করবেন না। আমি অবশ্যই নিরাপদে ডব্লিউ জোনে পৌঁছবোই। সেখানে আমি জনগণের জন্য মনে প্রাণে কাজ করবো। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি- অর্থ, নারী, ক্ষমতা বা অন্য কোন ধরণের দুর্নীতি আমাকে স্পর্শ করবে না।" শহীদ নিখিল তার ওয়াদা শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলো (তার বিপ্লবী জীবনে কোনো খারাপ রেকর্ড ছিলো না।) গ্রুপটি কাউখালী জোনে পৌঁছলে সে বিচক্ষণতার সহিত ইনফরমারদের ও আর্মী ক্যাম্পের যোগসাজশের তথ্যাদি উদঘাটন করে এবং তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা করে গ্রুপটাকে নিয়ে ডব্লিউ জোনে নিরাপদে পৌঁছে যায়।

ডব্লিউ জোনে স্বাধীন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার সময় সে রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের কোনঠাসা করে রাখে, জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দীপ্ত করে অতীতের সকল সময়ের চাইতে বেশী করে আন্দোলনের স্বপক্ষে সমাবেশ ও সংগঠিত করতে সমর্থ হয়। জনগণ তাকে খুবই ভালবাসতো। তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের কাছে সে 'কালা দাদা' নামে সমধিক পরিচিত ছিল। গায়ের রং শ্যামলা ছিল বলে এরা আদর করে নাম দিয়েছিল কালা দাদা। সেনাবাহিনীর অপারেশনে এরা কালাদাদা ও জোনের অন্যান্য সদস্যদের নানান কৌশল অবলম্বন করে রক্ষা করতো।

'জনগণই শক্তির মূল উৎস'- বিপ্লবের এই মহান বাণীর সাথে শহীদ নিখিল একাত্ব হয়ে গিয়েছিল বলে সে যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন অপরাজেয় হয়ে জনগণের মাঝে কাজের সফলতা অর্জন করেছিল। এই বিপ্লবী গুণ খুবই কম জনের মধ্যে দেখা যায়। সে সাহসী যোদ্ধা, সঠিক রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত, নিবেদিত একজন রাজনৈতিক কর্মবীর, দক্ষ সংগঠক, দুরদৃষ্টিসম্পন্ন, বিচক্ষণ, প্রত্যুৎপন্নমতি, সহজ-সরল, যৌথ জীবন যাপনে শৃঙ্খলা পরায়ণ, আয়ের উৎস সন্ধানে ঈগলের শ্যেন দৃষ্টি, দলীয় আর্থিক জীবনে সৎ ও মিতব্যয়ী, সহযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মী ও যত্নবান, সিনিয়রদের প্রতি নিঃশর্ত অনুগত্য, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সেবাপরায়ণ এবং মা বোনদের প্রতি আপন মা বোনের মতো প্রগাঢ় স্নেহ, মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল অকৃত্রিম। এতগুলো সৎ গুণ সম্পন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে তাদের পারিবারিক জীবনে বিশেষ করে সংস্কৃতিমনা মায়ের পরশে আয়ত্ব করে, যা তার বিপ্লবী কর্মবহুল জীবনে আরো বেশী প্রস্ফুটিত হয়।

উচ্চ মানবিক গুণাবলী না থাকলে একজন বিপ্লবী হওয়া যায় না। বিপ্লবী সংস্কৃতি একজন বিপ্লবীকে তার কর্মজীবনে বাঁচিয়ে রাখে, নেতৃত্বের প্রথম সারিতে নিয়ে আসে। বিপ্লবী ছাড়া একটা বিপ্লবী পার্টি প্রাণহীন ও অসার হয়ে পড়ে। তেমনি বিপ্লবী সংস্কৃতিবিহীন একটা গেরিলাবাহিনী গড়ে উঠতে পারে না এবং প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তাই একজন কর্মীকে বিপ্লবী পর্যায়ে গড়ে উঠার জন্য কঠিন দলীয় জীবন ও জনগণের কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত হতে হয়। শহীদ নিখিল এই কঠিন ও ত্যাগের পথ পরিক্রম করে একজন সাচ্চা বিপ্লবী হতে পেরেছিলো। এখানে একটা উদাহরণ তুলে না ধরলে বোধ করি তার সম্পর্কে আমার স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সরকারের চাপে পড়ে তার মা তার সাথে দেখা করতে যান। মায়ের সবকথা শুনে সে বলেছিলো-"তুমি আমার গর্ভধারিনী মা, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের আরো হাজার হাজার মা রয়েছে। এরা আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমরা জয়যুক্ত হতে পারলে তোমাদের চোখের জল মুছে দিতে পারবো। এখন আমি তোমার দুচোখের আড়াল হবো কিন্তু হাজার হাজার মায়ের চোখে চোখে আমি বেঁচে থাকবো।" সত্যিই শহীদ নিখিল আজ আর আমাদের মাঝে নেই, গর্ভধারিনী মায়ের দু'নয়নের মাঝে এখনো বেঁচে আছে। ঠিক তেমনি পার্বত্য চট্টলার হাজার হাজার মায়ের দু'নয়নের মাঝে ঠাঁই পেয়েছে। তাঁদের মানসপটে সে চিরদিন বেঁচে থাকবে। সে মৃত্যুকে জয় করেছে। হাজার হাজার মায়ের ছেলে না হতে পারলেও যেমনি বিপ্লবী হওয়া যায় না তদ্রুপ মৃত্যুকেও জয় করা যায় না।

আন্দোলনের একটা পর্যায়ে এসে পার্টিতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় তৎকালীন এরশাদ সরকার সাড়া দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন সরকার নিজ উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন সম্পর্কে অমুলক, ভ্রান্ত কুয়াচ্ছন্ন ধারণা দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সামনে থেকে অপসারণ করে এবং জেএসএসকে একটা রাজনৈতিক শক্তির স্বীকৃতি দিয়ে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে জেএসএস এর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক বসে। এটা জেএসএস এবং পার্বত্য জনগণের কুটনৈতিক বিজয়। দু:খের কথা তখনকার জুম্ম দালালদের কারণে এই কূটনৈতিক বিজয় রাজনৈতিক বিজয়ে রূপ নিতে পারেনি। ফলে যুদ্ধ বিরতির অবসান হয় এবং রক্তাক্ত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তারই প্রস্তুতি স্বরূপ অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় নিখিলসহ সে: লে: সফল, কিরণময় চাকমা এবং অন্য একজন ১৯৮৯ সনের ১৯ জুন তারিখ শাহাদাৎ বরণ করে। বিয়োগান্তক এই পরিণতিতে চারজন বিপ্লবীর কর্মজীবন থেমে যায়। তাই বলে তাদের মহান বিপ্লবী কর্মকান্ড এর ধারাবাহিকতা থেমে যায়নি। বরং আজ ১৮ তম জুম্ম জাতীয় শোক দিবসে বলবো- তাদের মহান আত্মত্যাগ আগামী দিনের বিপ্লবীদের জন্য পথ চলার বিপ্লবী প্রেরণা যোগাবে।

◆

মৃত্যু যাদের করেছে মহান

বিমলেন্দু চাক্‌মা

যাদের আত্মবলিদান অনুপ্রেরণার উৎস

যে জাতি তার বীর সন্তানদের উপযুক্ত সম্মান করতে জানে না সে জাতি পৃথিবীতে কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা। বিশ্বের উন্নত জাতিরা তাই তাদের বীর সন্তানদের সর্বাগ্রে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। জাতির যে সব সন্তান জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে, জাতির দুর্দিনে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে জাতির সেবায় এগিয়ে আসেন তারাই সে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বীর সন্তান, বীর শ্রেষ্ঠ। একটা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে তার বীর সন্তানেরা। এরাই জাতির গৌরব, জাতির অহংকার, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি। এরাই জাতির প্রাত:স্মরণীয়। এরাই জাতির পথ প্রদর্শক, জাতির আসন্ন দুর্যোগে আলোকবর্তিকা।

প্রাচীন যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান উপাদান হচ্ছে জাতীয় বীরদের বীরত্ব ব্যঞ্জক কাহিনী। বলা যায় বীরদের কাহিনী অবলম্বন করেই সাহিত্য তার যাত্রা শুরু করে। অন্ধকবি হোমার গ্রীক বীরদের নিয়ে রচনা করেন ওডিসি। রামায়ন, মহাভারত, শাহনামা ইত্যাদি মহাকাব্য সবই বীর বন্দনা ছাড়া কিছুই নয়। গ্রীক, রোমান এবং আর্যদের দেবদেবীর চরিত্রে ও মানুষ বীরকে আবিষ্কার করেছিল। তাই বীরত্ব ছাড়া কোন জাতি গড়ে উঠতে পারে না।

একটা জাতির বিকাশে জাতিকে অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে যেতে হয়। মানব সমাজের ইতিহাস হচ্ছে ক্রমশ: অন্ধকার হতে আলোর পথে যাত্রার ইতিহাস। পৃথিবীর ছোট-বড় প্রত্যেক জাতিকে নিজেদের স্বদেশভূমি ও স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য যুগে যুগে লড়াই-যুদ্ধ করতে হয়েছে। এসব যুদ্ধে শত শত হাজার হাজার মানব সন্তানকে নিজের জাতির জন্য আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। যুদ্ধে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা পেয়েছে এবং যারা পরাজিত হয়েছে তাদের স্বাধীনতা হরণ হয়েছে। পৃথিবীতে অপরাজেয় জাতি বলে কোন জাতি দাবী করতে পারে না। যে জাতি নেপোলিয়নের মত বীর জন্ম দেয় তারা হিটলারের জামার্নীর কাছে ছিল শিশুর মত দুর্বল। পৃথিবীর আদিম যুগের অনেক শক্তিশালী জাতিও আজ বিলুপ্ত হয়েছে যুদ্ধে পরাজয় বরণের কারণে। বীরভোগ্য বসুন্ধরা। দুর্বলের জন্য এপৃথিবী নয়, বীরকে বরণ করে এ পৃথিবী ধন্য। বীর মৃত্যুকে ভয় করে না। বীরের মৃত্যু নেই। আর জাতির পরাধীনতায়, জাতির দুর্দিনে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা এগিয়ে আসে না, অন্যায় ও অমানবিতার বিরদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না, নিজের ব্যক্তিস্বার্থে মশগুল থাকে, মীরজাফরী করে, আনন্দ উল্লাস, ভোগ বিলাস ও ইন্দ্রিয় পরায়ণে লিপ্ত থাকে তারাই কাপুরুষ, নীচ ও হীন ব্যক্তি। এরা মানসিকভাবে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ। দুর্নীতি ও অনৈতিকতা এদের প্রধান অবলম্বন। এরা আলোর চাইতে অন্ধকারকে বেশী পছন্দ করে। এরা ঘৃণ্য, পশুর চেয়েও অধম। নপুংসক, অধম, কাপুরুষ, হীন স্বার্থবাদী, সংকীর্ণমনা, ভোগবাদী, আনন্দবাদী, ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তি জাতির কলঙ্ক।

জুম্ম জাতি বীর জাতি। যুগে যুগে জুম্ম জাতি নিজের মাতৃভুমির স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বকে রক্ষা করে এসেছে। জাতির ভাগ্যাকাশে যখনই কালোমেঘ ছায়া ফেলেছে জাতির বীর সন্তানেরা তখনই জীবনের বিনিময়ে জুম্ম জাতিকে রক্ষা করেছে। রাধামন ধনুপদির উপাখ্যান এখনো জুম্ম জাতির জীবন চলার আলোকবর্তিকা, পরাধীনতা আর শৃঙ্খলের বিরূদ্ধে জুম্ম জাতির পথের নিশানা। মোগল, বৃটিশ শাসনের বিরূদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিল রনু খান ও সের দৌলত খানেরা। এদের ইতিহাসই জুম্ম জাতির জীয়ন কাঠি।

একটা জাতির জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে তার আত্মবিশ্বাস । আত্মবিশ্বাস ছাড়া কোন জাতি নিজের আপন মহিমায় গড়ে উঠতে পারে না। একটা সিংহ শাবক সিংহ হয় তার আত্মবিশ্বাসের জন্য আবার একটা শেয়ালের বাচ্চা শেয়াল হিসাবে বেড়ে ওঠে সেও তার আত্মবিশ্বাসের কারণে । দুশ বছরের পরাধীনতায় আত্মবিস্মৃত হয়ে জুম্ম জাতি যখন তার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকারে পথ হাতরাচ্ছিল তখন জুম্ম জাতির ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ভ্রাতৃদ্বয়। দুই ভাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করে জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলেন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন। প্রতিষ্ঠা করা হয় জুম্ম জাতির সশস্ত্র বাহিনী শান্তি বাহিনী। দীর্ঘ ২৪ বৎসরের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে আধুনিক ইতিহাসে বীর জাতির আসনে স্থান করে নেয় জুম্ম জাতি। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি"। এই চুক্তি বিশ্বের দরবারে জুম্ম জাতিকে করেছে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। হয়েছে জুম্ম জাতির হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার। জুম্ম জাতি আজ নিজের পরিচয়ে উদ্ভাসিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিষয়ে অনেকের মতভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে এই চুক্তি অর্জিত হয়েছে। এই চুক্তি কারো দয়া বা করুণায় সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হাতে কলমপতি গণহত্যা থেকে সর্বশেষ লোগাং গণহত্যা পর্যন্ত কমপক্ষে এক ডজন গণহত্যায় শত শত নিরস্ত্র জুম্ম জনগণ শহীদ হন, হাজারো মা-বোনের ইজ্জত হয় লুণ্ঠিত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন শত শত নিরপরাধ জুম্ম, সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম হয় জ্বলে পুড়ে হয়েছে ছারখার, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের এই সংগ্রামে। হাজার হাজার পরিবার নিজের বাস্তুভিটা হারিয়ে স্বদেশে হয়েছিল উদ্বস্তু

বিদেশে হয়েছিল শরণার্থী। সর্বোপরি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে বীরের মত প্রাণ দিয়েছেন শান্তিবাহিনীর দুই শতাধিক বীরযোদ্ধা। জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার শপথ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এরা অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম গিরি-প্রান্তরে, জুম্ম জনগণের মুখে মুখে এখনো তাদের বীরত্বগাথা শোনা যায়। আজ ১০ই নভেম্বর ২০০১ সালে শান্তিবাহিনীর ৩ জন বীর যোদ্ধার সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার অবতারণা করে সকল শহীদের অবদান ও স্মৃতিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

শতাব্দীর জুম্ম বীর শহীদ রাম

বীর যোদ্ধা রাম শান্তিবাহিনীর ইতিহাসে তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে একটি অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয় নাম। শহীদ রামের জন্ম হয় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সদর থানার অর্ন্তগত ১০৫ নং জীবতুলি মৌজার জীবতুলি গ্রামে ১৯৫৮ সালে এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে। কাপ্তাই বাঁধ হবার পর তাদের পরিবার বর্তমান বাঘাইছড়ি থানার জীবতুলি গ্রামে বসতি স্থাপন করে। তাঁর পিতার নাম ভারত চন্দ্র চাকমা আর মাতার নাম সাধকবী চাকমা। শ্রীরাম এর আসল নাম অনিল কুমার চাকমা। দুই ভাই একবোনের মধ্যে শ্রী রাম দ্বিতীয়। কাচালং হাই স্কুলে তিনি ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। শ্রী রাম শৈশব ও বাল্যকালে বেশ ডানপিঠে ছিলেন বলে জানা যায়। লেখাপড়ায় রাম বেশ ভাল ছিল বলে তার এক সহপাঠি হতে জানা যায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে শান্তিবাহিনী গঠিত হলে ১৯৭৫ সালে রাম লেখাপড়া ত্যাগ করে শান্তিবাহিনীর কাচালং জোনে ভর্তি হন। কাচলং জোনের কমান্ডার শ্রী অনিক তাকে পার্টিতে ভর্তি করেন। শ্রী অনিল পার্টিতে তার নাম রাখেন রাম। পরবর্তী জীবনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাম নামে পরিচিতি লাভ করেন। ভর্তি করার পর জোন কমান্ডার শ্রী অনিক ঐ বৎসরই তাকে প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সামরিক একাডেমীতে পাঠিয়ে দেন। শ্রী অনিক সে সময় কাচলং এলাকায় পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য কেন্দ্র হতে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মেধার কারণে প্রশিক্ষণের পর পরই রাম ঐ একাডেমিতে প্রশিক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৭৬ সনে প্রতিষ্ঠা করা হয় "ই" এবং "এফ" কোম্পানী। শ্রী রাম ই কোম্পানীতে মুল ব্যাসে সার্জেন্ট বা লিয়াঁজো কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ পান।

প্রতিষ্ঠার পর ই এবং এফ কোম্পানীর পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক অপারেশনে নিযুক্ত হয়। ১৯৭৬ সনের আগষ্ট মাসে ই এবং এফ কোম্পানী সম্মিলিতভাবে বিলাইছড়ি থানার অর্ন্তগত রেইংখং ভেলীর ফারবা বিডিআর ক্যাম্প আক্রমণ করে। উদ্দেশ্য অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধ শেখা। যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন শহীদ মেজর মংলা মারমা, শহীদ মেজর জুলো, মেজর ধ্রুব। শহীদ মংলা এবং শহীদ জুলোর নাম জুম্ম জাতির ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে। এরা দুজনই পার্টির প্রথম সারির নেতা ছিলেন এবং ১৯৭২ সাল থেকে পার্টির কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই দুজনই সর্বহারা পার্টি এবং এমএনএফদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পার্টিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করার পর পরবর্তীতে শহীদ হন। ফারবা যুদ্ধ পুরোপরি সফল না হলেও বিডিআরদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এই যুদ্ধে রাম অংশ নেন। এর পরবর্তী ৬ মাস ধুপশিল মোন এলাকায় ক্রমাগত যুদ্ধ চলে বিডিআর এবং ই কোম্পানীর মধ্যে। রামরা এর মধ্যে ১টা বিট্রিশ এলএমজি ও ২টা .৩০৩ রাইফেল হস্তগত করেন। পুরো ৭৭ সাল রামেরা যুদ্ধে লিপ্ত থাকে কর্ণফুলি ভেলীতে তথা বরকল থানা এলাকায়। প্রথমে কলাবন্যা, এরপর গোরস্থান, অজ্যাংছড়িতে রামেরা বিডিআরের উপর হামলা করেন। এসব হামলায় অনেক বিডিআর হতাহত হয়। কিছুদিন পর রামেরা বড় হরিণ মুখে বিডিআরের উপর হামলা করে ১১টি হাতিয়ার দখল করে নেন এবং অনেক বিডিআরকে হতাহত করে। ইতিমধ্যে রাম নিজেকে একজন সাহসী ও বিচক্ষণ যোদ্ধা হিসাবে গড়ে তোলেন।

৭৭ সালে এমএনএফের সংগে শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষ বাঁধে রেইঙখং, থেগা, ভোগা ও রূমা এলাকায়। রামেরা সেদিকে যেতে বাধ্য হন। প্রথম সংঘর্ষে রামেরা রূমা এলাকায় মিজোদের বিদেশমন্ত্রীকে নিহত করে। এরপর মিজোরা আক্রমণ করে রেইঙখং এর উলুছড়ি তনচঙ্গা পাড়াতে। এতে শান্তিবাহিনীর লেঃ অনিমেষ, আনন্দ, সাইক্রোন ও ব্যবিলন শহীদ হন। লেঃ অনিমেষ ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার। মিজোদের হাতে নিহত এই চারজন শহীদের নাম জুম্ম জাতি ও শান্তিবাহিনীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিরূপ ও অপরিচিত পরিবেশে উপর্যুপরি মিজো হামলা ও ক্ষয়ক্ষতির কারণে ই কোম্পানী যোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। বেশ কিছু সদস্য দল ত্যাগ করে। জানা তখন রাম এবং জনৈক পোলান্ড এই দুজনের অনমনীয় জেদ ও সাহসের কারণে পরবর্তীতে আক্রমণ করে মিজোরা ঐ এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মিজো অপারেশনে শহীদ মংলা, শহীদ জুলো, মেজর পেলে, লেঃ মানস, শহীদ লেঃ অনিমেষ ও শান্তি, শুক্র, সুভাষ, মাওসেতুং ইত্যাদিসহ তৎকালীন ই এবং এফ কোম্পানীর সকল বীর যোদ্ধার কাছে জুম্ম জাতি চিরদিন ঋণী থাকবে। এদের কাছে না ছিল প্রয়োজনীয় অস্ত্র, গোলাগুলি, ট্রেনিং, খাদ্য এবং বস্ত্র। নিরেট দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনারউদ্বুদ্ধএরা অসাধ্যকে সাধন করেছিল। মিজোদের তুলনায় এসময় শান্তিবাহিনীর অস্ত্র ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কোন তুলনাই করা যায় না। তদুপরি ঐসব অঞ্চল ছিল দুর্গম, অপরিচিত ও মিজো অধ্যুষিত এবং ১৯৬২ সালের পর থেকে এমএনএফের গোপন হেডকোয়ার্টার এলাকা।

৭৭ সালের ২৯মে বান্দরবানের উদোল বন্যা নামক স্থানে হামলা চালিয়ে শান্তিবাহিনী একটি আর্মি কনভয়কে আক্রমণ করে ২২টি চাইনিজ হাতিয়ার দখল করে নেয়। এই যুদ্ধ মাত্র পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়। উক্ত যুদ্ধেও রাম বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরপর রেইঙখং শুকরছড়ি গ্রামে রামেরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে রামদের ২ জন নিহত ও ৩ জন ধৃত হন। এই ঘটনায় রামের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য পুরো দলটি নিশ্চিহ্ন হবার পথ থেকে রক্ষা পায়।

৭৭ সালের সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসের ঘটনা। লেফটেনেন্ট কামালের নেতৃত্বে ৬০ জনের একদল আর্মি জুরাছড়ি থানার দুমদুমা ইউনিয়নের থেগা ভেলীর জামেরছড়িতে বিনাযুদ্ধে গভীর জঙ্গলে অবস্থিত রামদের ব্যারেক দখল করে নেয়। রামেরা সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে চলার জন্য ব্যারেক ছেড়ে দেয়। পরদিন দুপুর বেলায় সুভাষ এবং অন্য একজনকে সংগে নিয়ে রাম ক্যাম্পের এলাকায় ঢুকে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সেনাবাহিনীর ১২ জন সদস্য হতাহত হয় বলে পরে জানা যায়। হেলিকপ্টারের সাহায্য সেনাবাহিনীরা লাশ বহন করে নেয়।

১৯৭৮সাল। রামদের অবস্থানের খবর পেয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬৫ জনের একদল সেন্য রেইংখং উলুছড়ি মোন এলাকায় অপারেশনে যায়। আর্মিরা মোনের উপর একটা জুম চাপে (জুমের চাষের জন্য গ্রাম) অবস্থান নেয়। এলাকায় একটা প্লাটুন নিয়ে অবস্থান করছিল রাম। সাহায্যের জন্য কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠায় রাম। কিন্তু সাহায্যের জন্য যে দল যাচ্ছিল তারা পৌঁছার আগেই ভোর রাতে ১৮ জনের দলকে তিনটা দলে বিভক্ত করে রাম শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৩০-৩৫ জন শত্রুকে রাম হতাহত হয়। রামদের গুলি ফুরিয়ে গেলে বাকী শত্রুরা রক্ষা পায়। রামদের গ্রুপ একটা এলএলজি দখল করে নেয়। সেনাবাহিনীর কমান্ডার ক্যাপ্টেন আনোয়ার ঘটনায় নিহত হয় বলে জানা যায়।

১৯৮০ সালে জুরছড়ি উপজেলার খাগড়াছড়ি এলাকার ঘন্তিছড়া নামক স্থানে আক্রমণ করে মেজর মহসিন রেজার নেতৃত্বাধীন একদল আর্মিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয় শান্তিবাহিনী। এই হামলায় অংশ নেয় ই এবং এফ কোম্পানীর বাছাই করা যোদ্ধারা। অনেকের মধ্যে রামও এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শান্তিবাহিনীরা এই যুদ্ধকে ঘন্তিছড়া যুদ্ধ বলে উল্লেখ করে থাকে।

১৯৮০ সালের কথা। বড় হরিণার ডুলুছড়ি মুখের সামান্য উপরে বিডিআরের ড্রেস পরিহিত বাংলাদেশ আর্মির ৫০-৬০ জনের একটি দল ক্যাম্প স্থাপনের জন্য অবস্থান করছিল। এলাকার কাছাকাছি নিজ পরিবারের সাথে ছিল শ্রী রাম। আর্মি আসার খবর পাওয়া মাত্র রাম দেরী না করে ক্যাম্পে যান। সেখান হতে ২ জন সঙ্গী নিয়ে রাম পরদিন আর্মিদের পানিঘাটে লুকিয়ে থেকে হামলা করে। ৭-৮ জন আর্মি হতাহত হয় বলে পরে জানা যায়। আর্মিরা ক্যাম্প না দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। জানা যায় স্ত্রীকে ফেলে আসার সময় তার স্ত্রী তাকে শিশু কন্যাসহ নিরাপদ স্থানে সরানোর অনুরোধ জানালে তার সময় নেই বলে সে চলে আসে। যুদ্ধ করা শত্রু নিধনের এক অদম্য নেশা সবসময় তার অন্তরে কাজ করত। যুদ্ধ ছাড়া তার কিছুই ভাল লাগত না বলে সহযোদ্ধাদের কাছে জানা যায়।

১৯৭৭ সাল থেকে রাম রেইংখং থেগা ভোগা ও কর্ণফুলি এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে এবং ই এবং এফ কোম্পানীতে বীর যোদ্ধা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং সকলের প্রিয় পাত্র হন। পার্টির নিকট একজন বিচক্ষণ, নির্ভরযোগ্য ও সাহসী যোদ্ধা হিসাবে তিনি স্বীকৃত হন। শত্রুবাহিনীর ত্রাসে পরিণত হয় রাম-এর নাম।

১৯৮৩ সালে শান্তিবাহিনীতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। গৃহযুদ্ধের আবির্ভাবে রাম বিমর্ষ হন। তিনি আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে যুক্তি দেখান। জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পথে কলঙ্কিত এই অধ্যায় রাম মেনে নিতে চাননি অন্য সকলের মত। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রাম অস্ত্র ধরেন সবার আগে। পানছড়ির গোলকপ্রতিমা ছড়ার গভীর জঙ্গলে ১৪ জুনের ঘটনায় বিভেদপন্থিদের যখন পরাজিত করা যাচ্ছিল না তখন রাম ৪ জন যোদ্ধাকে বেছে নিলেন। শত্রুর নিকটে গিয়ে প্রথমে ৫ জন এক সঙ্গে ৫টি গ্রেনেড ছুড়লেন তারপর একে-৪৭ রাইফেলের ব্রাশ করতে করতে ৫ জন একসঙ্গে অগ্রসর হয়ে দখল করে নিলেন শত্রুর শক্ত অবস্থান। এভাবেই বিভেদপন্থীদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয় ১৪ই জুনের ঘটনায়।

কিছুদিনের মধ্যে রাম সমগ্র বিশেষ সেক্টর এলাকায় বিভেদপন্থিদের ত্রাসে পরিণত হন। রাম সহযোদ্ধাদের ঘোষণা দিলেন বিভেদপন্থীদের সাথে মুখোমুখী হলে পিছপা হওয়া যাবে না। সেই থেকে পার্টির যোদ্ধারা বিভেদপন্থীদের সাথে কোন যুদ্ধে পিছু হটে যায়নি। গোলকপ্রতিমা এলাকায় বিভেদপন্থীদের খুঁজে বের করার জন্য রাম এক অভিনব পদ্ধতি প্রচলন করলেন। দিনের বেলায় সন্দেহজনক এলাকা বেষ্টন করে প্রতিজনের হাতে দুটা বাঁশের কাঠি রেখে ঐ কাঠি বাজাতে বাজাতে সমগ্র এলাকায় তন্ন তন্ন করে খুঁজতেন রামেরা। বেড়াজাল দিয়ে যেভাবে জেলেরা মাছ ধরে ঠিক তেমন কৌশল। নিজেদের মধ্যে পরিচিতির জন্য বাঁশের কাঠি বাজানো হত। কিছুদিনের মধ্যে বিভেদপন্থীরা কোনঠাসা হয়ে পড়ে।

শ্রী রামের মৃত্যু এক অবর্ণনীয় বিষাদময় ঘটনা। শান্তিবাহিনীর জন্য এটা এক করুণ ট্রাজেডি। শত্রুর হাতে রামের মৃত্যু ঘটেনি। বিভেদপন্থী অপারেশন হতে ফেরার পথে দুই দলে ভাগ হয়ে রামেরা খাগড়াছড়ি সদর থানার সন্নিকটে পেরাছড়ার গুলকানা পাড়ায় ফিরে যাচ্ছিল। তারিখটি ছিল ১৯৮৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। কথা ছিল রামদের গ্রুপ শেষে পৌঁছবে। ঘটনাক্রমে রামের আগে পৌঁছে যায় গুলকানা পাড়ায়। এরপর অন্য দলটা যখন সেখানে পৌঁছে শত্রু (বিভেদপন্থী) মনে করে তারা রামদের উপর শুরু করে গুলি বর্ষণ। রাম গুদাম ঘর থেকে বের হয়ে চিৎকার করে ডাক দিতে থাকে "আমি তোমাদের রাম, আমরা তোমাদের লোক"। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। ঘাতক বুলেট চিনতে পারেনি সে ছিল জুম্ম জাতির একনিষ্ঠ সেবক বীরশ্রেষ্ঠ রাম। রামের স্মৃতিতে আজ তাই শান্তিবাহিনী এত নির্বাক। রামের স্মৃতি দমবন্ধ হওয়া এক দুঃস্বপ্ন সমগ্র পার্টি ও শান্তিবাহিনী ও জুম্ম জাতির জন্য। যে রাম শান্তিবাহিনীকে একটা পেশাদার সেনাবাহিনীর রূপ দেবার আশায় এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যে রাম শান্তিবাহিনীকে একটা আত্মবিশ্বস্থ বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার আশায় দুঃসাহসী সব যুদ্ধ করেছেন, যে রাম মিজো হামলায় বিপর্যস্ত শান্তিবাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য জেদ ধরেছিলেন তার মৃত্যু হল তার সহযোদ্ধার গুলিতে। হয়ত রাম এভাবে মৃত্যুবরণ করে জুম্ম জাতিকে একটা দিশা দিতে চেয়েছিলেন। কারণ গৃহযুদ্ধের প্রবল বিরোধিতা করছিল রাম। সে বলত ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ পরিহার করা দরকার।

ক্ষুদ্র পরিসরে রামের কীর্তি গাথা বলে শেষ করা যাবে না। রামের শত কাজের মাত্র দুয়েকটির কথা এখানে তুলে ধরা হল। শহীদ রাম ছিলেন এক বিরল সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন বিস্ময়কর এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। রামের সাহস ও বিচক্ষণতা প্রমাণ করে জুম্ম জাতি অতীতে শৌর্য-বীর্যের জাতি ছিল। যুদ্ধের মত এক কঠিন বিষয়কে রাম সহজ ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছিলেন। সাহস, বিচক্ষণতা, ধৈর্য্য, চৌকষ জ্ঞান একজন প্রকৃত সামরিক কমান্ডারের সকল গুণের অধিকারী ছিল রামের। রাম সুস্বাস্থের অধিকারী ছিলেন। মাঝারি গড়নে পাতলা দেহে শ্যামবর্ণে রামের চেহারাও ছিল অত্যন্ত সুন্দর। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল অত্যন্ত সযত্নে সব সময় গুছিয়ে রাখতেন রাম। চব্বিশ ঘন্টা সামরিক ড্রেস পরিহিত থাকতেন। জলপাই রঙের পোষাক তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রাম অত্যন্ত চটপটে ও কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। কঠিন জীবনেও তিনি বেশ লেখাপড়া করতেন। চীনের সকল যুগের সামরিক শাস্ত্রসহ বিশ্বের সকল মুক্তি সংগ্রামের বই, মানব সমাজের ইতিহাস তার প্রিয় পাঠ্য ছিল। সকল পরিবেশে রাম সহজে নিজেকে মানিয়ে নিতেন।

জানা যায় রামের পিতা ভারত চন্দ্র চাক্‌মাও একজন অত্যন্ত দক্ষ পল্লান (শিকারী) ছিলেন। তিনি তড়িৎ বেগে ধাবমান হরিণ গুলি করে মারতে সক্ষম ছিলেন বলে তার এক ঘনিষ্ট আত্মীয় হতে জানা যায়। যার পিতা এত দক্ষ শিকারী তার পুত্র রাম কেন বড় সাহসী যোদ্ধা হবে না। শহীদ রামের পিতা বহু পূর্বে মারা যান। তার মাতা সাধকবী এখনো জীবিত আছেন। রাম যতদিন জীবিত ছিলেন তার মাকে সঙ্গে রেখেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি রামকে চিকন মরত্তুয়া বলে ডাকতেন। এতে বোঝা যায় রাম তার মায়ের কত স্নেহধন্য ছিলেন। রামের একমাত্র বড় ভাই সুরঞ্জন চাক্‌মা (বৈদ্য) এখনো জীবিত আছেন। জানা যায় একসময় সুরঞ্জন চাক্‌মা শান্তিবাহিনীর সাহায্যকারী হিসাবে সেনাবাহিনীর হাতে ধৃত হয়ে নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং তিন বৎসরের মত হাজতবাস করতে বাধ্য হন।

১৯৭৮ সালে রাম রেইংখং উলুছড়ি গ্রামের মুরুঙী তঞ্চঙ্গ্যা নামীয় এক ষোড়শী সুন্দরীকে বিবাহ করেন। তার শ্বাশুরের নাম কেশচান তঞ্চঙ্গ্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বান্দরবান সদরের বালাঘাটা হতে কেশ চান তঞ্চঙ্গ্যারা তথায় বসতি স্থাপন করেন। জানা যায় ৭৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে করতে রাম মুরুঙী তঞ্চঙ্গ্যার প্রেমে পড়েন। তাদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত মধুর ছিল। বিবাহের পর তার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে মুরুঙী তঞ্চঙ্গ্যা সকলের মন জয় করেন এবং পলাতক জীবনে নিজেকে খাপ খাওয়ান। নিজের বিনম্র ব্যবহারে মুরুঙী তঞ্চঙ্গ্যা রামের মত সকলের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। রামের মৃত্যুর পর কিছুদিন পর ছোট মেয়ের জন্ম হয়। তার বড় মেয়ে লিপিকার জন্ম হয় ১৯৭৯ সালে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ১৯৯৭ সালে রামের প্রিয়তমা স্ত্রী মুরুঙী তঞ্চঙ্গ্যার অকাল মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রামের স্ত্রী আর্থিক অনটনে অত্যন্ত দুর্বিসহ জীবন যাপন করেন কারণ জনসংহতি সমিতি গোপনে অতি সামান্য মাসোহারা তাকে দিতে পারত।

শহীদ সোপান ঃ একজন দেশপ্রেমিকের নাম

জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে শহীদ সোপান একটি উজ্জল নাম। তার আসল নাম শান্তি কুসুম চাকমা। ১৯৬০ ইংরেজীতে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার নান্যাচর থানার বেতছড়ি গ্রামে এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে তার জন্ম হয়। কাপ্তাই বাঁধের কারণে পরে তার পিতা-মাতা মহালছড়ি থানাধীন মুবাছড়ি খুলারাম পাড়াতে বসতি স্থাপন করেন। তার পিতার নাম প্রবীণ চন্দ্র চাকমা। মাতার নাম ফুলবালা চাকমা। শান্তি কুসুম চাক্‌মা মুবাছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাইছছড়ি হাই স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অর্থাভাবে শান্তি কুসুম চাক্‌মা এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারেননি।

১৯৭৪ ইংরেজী শান্তি কসুম চাকমা দেশপ্রেমের টানে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি শান্তিবাহিনীর ২নং সেক্টরে যোগদান করেন। শান্তি বাহিনীতে ভর্তির পর তার নাম হয় সোপান। ১৯৭৫ সালে শান্তি বাহিনীতে থাকা কালে শহীদ সোপান সাপের কামড় খেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সামান্য সুস্থ হলে তিনি বাড়ীতে চলে আসেন। বাড়ীতে এক বৎসর চিকিৎসার পর সম্পুর্ণ সুস্থ হলে মা বাবার ইচ্ছায় ১৯৭৭ সালে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি আবার ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী মাসে আবার পার্টিতে যোগদান করেন।

১৯৮৩ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে সোপান বিভেদপন্থীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিশেষ সেক্টর এলাকায় যান। গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পর ২নং সেক্টর হতে কয়েক দফায় কয়েক শত যোদ্ধা বিশেষ সেক্টর এলাকায় যায়। শহীদ সোপান তাদের মধ্যে একজন। সেখানে বিভেদপন্থীদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর ১৯৮৫ সালে ২নং সেক্টরে ফেরত আসেন।

২নং সেক্টরের বিভিন্ন জোনে শহীদ সোপান কাজ করেন। ১৯৮৫ সালে শহীদ সোপানকে নান্যাচর জোনে বদলি করা হয়। নান্যাচর জোনে তাকে অর্থ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, শত্রু পরিবেষ্টনে থেকে কাজ করতে হয় বলে অর্থ সংগ্রহের কাজ সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ। শান্তিবাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে সবচেয়ে শহীদ হয়েছেন সংগ্রাহকরাই। জীবন বাজি রেখে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় কাজ করে অর্থ যোগান দিয়ে পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখেন এরাই।

১৯৮৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর নান্যাচর থানার বেতছড়ি মুখে শহীদ সোপান অতর্কিতভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হন। সেদিন সোপান অর্থ সংগ্রহের কাজে জড়িত ছিলেন না। সেদিন সকালে সে ফিরিঙি পাড়া বৌদ্ধ বিহারে ফুল টাঙোন ওড়ানোর পর মুবাছড়ি গ্রামে তার স্ত্রী পুত্রদের নিকট সংবাদ পাঠাবার জন্য একটা বাড়িতে যাবার পথে কিছুক্ষণের জন্য তার আপন কাকার সাথে কথা বলছিলেন। শহীদ সোপান তখন নিরস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে পশ্চিম পাড়ে

পালিয়ে যাবার আশায় শহীদ সোপান পানিতে ঝাঁপ দিয়ে সাতাঁর কাটতে থাকেন। সেনাবাহিনীর সদস্যেরা দাঙ্গা থেকে তাকে গুলি করতে থাকে এবং তাকে কূলে এসে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। কিন্তু সোপান আত্মসমর্পণ করবে না বলে জানান এবং তাকে গুলি করতে বলেন। শান্তিবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে জানে না বলে সোপান চিৎকার করতে থাকেন। শহীদ সোপান বলতে থাকেন "আজ যদি আমার হাতে অস্ত্র থাকতো তাহলে তোমাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতাম"। আর্মিদের পুরো দল তাকে দুই দিক থেকে গুলি করতে থাকে। প্রথমে সোপান গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। গুরুতর আহত ও মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে পানি থেকে তোলা হয়। দাঙ্গায় তোলার সাথে সাথে তার উপর নির্যাতন করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে সোপানের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পরও সোপানের মৃতদেহের উপর অনেকক্ষণ ধরে আর্মিরা অত্যাচার করে। আর্মিরা প্রত্যেকে একে একে বুট দিয়ে নৃশংসভাবে সোপানের লাশের উপর লাথি মেরে প্রতিশোধ নেয় কারণ আর্মিদের কাছে সোপান ছিলেন আতংক সৃষ্টিকারী। সোপানের আপন কাকার সম্মুখে এইসব দৃশ্য চলছিল। সোপানের কাকা ছাড়াও গ্রামের অনেকের সম্মুখে এই ঘটনা সংঘটিত হয় দিনের বেলায়। আর্মিরা তাকে ঘটনাস্থলেই গ্রামবাসীদের মাধ্যমে মাটি চাপা দেন। বারবনিয়া জোনে অবস্থিত ২৬ বেঙ্গলের লেঃ খালেক এই অপারেশন করেন।

অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে ঘটনার ছয়মাস পর শহীদ সোপানের স্ত্রী বেতছড়ি মৌজার হেডম্যান শ্রী তিলক চন্দ্র চাকমার সহায়তায় শহীদ সোপানের মৃতদেহ তুলে নিয়ে নিজ গ্রাম মুবাছড়িতে সামাজিক নিয়মানুসারে দাহ ও শ্রাদ্ধক্রিয়াদি করতে সমর্থ হন। শহীদ সোপানের একমাত্র বড়ভাই শ্রী যাদবেশ্বর চাকমাও ১৯৮১ ইংরেজীতে মিথ্যাভাবে শান্তিবাহিনী অভিযোগে নিজ বাড়ীতে গ্রেপ্তার হন এবং তিন বছর কারাবরণ করেন। শহীদ সোপান অত্যন্ত অমায়িক ও কর্তব্য পরায়ণ কর্মী ছিলেন। দলীয় দায়িত্ব পালনে সে ছিল সবসময় সচেতন। তার স্ত্রীর নাম শুচীতা চাকমা। মৃত্যুকালে সে এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। আত্মীয়-স্বজন ও জেএসএস-এর সহায়তায় শহীদ সোপানের স্ত্রী পুত্ররা কোনমতে বেঁচে আছেন। সোপানের স্ত্রী ১৯৮৯ সনে মোনঘরে চাকুরীতে যোগ দেন এবং গত বছর ২০০০ ইংরেজী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে চাকুরী লাভ করে।

শহীদ ভূবন ঃ ফুটল না যে ফুল

শান্তিবাহিনীর ইতিহাসে শহীদ ভূবনের নাম চিরদিন অম্লান থাকবে। শহীদ ভূবন ১৯৬৫ সনে (৯ ফাল্গুন) লংগদু থানার অর্ন্তগত আটারকছড়া মৌজার করল্যাছড়ি গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার আসল নাম শান্তি লোচন চাকমা। তার পিতার নাম পেশ মোহন চাকমা। মাতার নাম মোহন বালা চাকমা।

শহীদ ভূবন স্থানীয় করল্যাছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে শান্তি শোভন দ্বিতীয়। ভূবনের বড় ভাই কালাচাঁদ চাকমা। তিন বোন সবাই ভূবনের ছোট। এঁরা যথাক্রমে অরুনা চাকমা, তুম্ভবী চাকমা ও বাসনা চাকমা। ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট পূর্ণ বিকাশ চাকমা। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৯ সনে লংগদু উপজেলার বগাচতর, গুলসাখালী, রাঙীপাড়া, মাইনিমুখ, আটারকছড়াসহ করল্যাছড়িতে সমতল জেলা থেকে বেআইনীভাবে সেটেলারদের এনে বসতি স্থাপন করালে শহীদ ভূবনরা অন্যান্য সকলের মত তাদের জমি ও বসতভিটা হারান। এতে তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়লে শহীদ ভূবনের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। জমি হারানোর পর ভূবনদের পরিবার আটারক ছড়া মোন এলাকায় জুমচাষ করতে বাধ্য হয়।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শহীদ ভূবন ১৯৮১ সনের ৮ অক্টোবর শান্তি বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি স্থানীয় ২নং সেক্টরে ভর্তি হন। তখন শান্তিবাহিনীতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ভর্তি হবার পর নিজের অমায়িক ব্যাবহার ও হাসিখুশি স্বভাবের কারণে কিছুদিনের মধ্যে সকলের প্রিয়পাত্র হন। তার চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি এমন আকর্ষনীয় ছিলেন যে একবার তাকিয়ে দেখেছে আজীবন তাকে ভুলতে পারেনি। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। বাড়ীর সবার ছোট ছেলে যে আদর পেয়ে থাকে শহীদ ভূবন পার্টিতে তাই পেলেন।

ট্রেনিংয়ের পর তাকে লংগদু জোনে বদলি করা হয়। ১৯৮৪ সনের ২০ ফেব্রুয়ারী শহীদ ভূবন এবং লেন্স কর্পোরেল কৃতি দলীয় কাজে জোন কমান্ডার সনাতন এর সাথে লংগদু রাঙাপানিছড়া গ্রামে পৌছেন। সেখানে এক বাড়িতে তারা রাত কাটান। পরদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল সোয়া সাতটায় তারা যখন রেড়িও খুলে শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান শুনছিলেন শহীদ ভূবনেরা হঠাৎ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হন। আর্মিরা সোর্সের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করে তাদের আক্রমণ করতে যান। গ্রামের ও পরিবারের লোকেরা হতাহত হবে ভেবে প্রথমে ফায়ার না করে সুবিধামত জায়গায় পজিশন নেয়ার জন্য ভূবনেরা দৌড় দিতে থাকে। সেনাবাহিনীরা চারিদিক থেকে গুলিবৃষ্টি করতে থাকে। জোন কমান্ডার এবং সেকেন্ড লেঃ আপন তখনো শত্রুর বেষ্টনির মধ্যে থেকে বের হতে পারেনি। তখন শহীদ ভূবন তার অটোমেটিক রাইফেল ও ভলান্টিয়ার কৃতি .৩০৩ রাইফেল দিয়ে সঠিক জায়গায় পজিশন নিয়ে গুলি চালাতে শুরু করে। তাদের গুলি চালানোর ফলে সেনাবাহিনীরা পজিশন নিতে বাধ্য হয়। এই ফাঁকে জোন কমান্ডার ও সেঃ লেঃ আপন শত্রুর বেষ্টনি থেকে বের হয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে সক্ষম হয়।

শহীদ ভূবন ও কৃতি প্রথমে একজন আর্মিকে গুলিবিদ্ধ করেন। কিছুক্ষণ পর শহীদ ভূবনও পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। আহত হবার পর শহীদ ভূবন একটা উচুঁ এবং অত্যন্ত সুবিধাজনক প্রাকৃতিক গুহায় পজিশন নেন যাতে কেবল এক দিক থেকে ঢুকা যায়। আর্মিদের প্রবল আক্রমণের ফলে লেন্স কর্পোরেল কৃতি পিছু হটতে বাধ্য হলে শহীদ ভূবন একাই শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। এই সময় শহীদ ভূবন আরো একজনকে গুলিবিদ্ধ করে নিহত করেন। একা পেয়ে আর্মিরা দিগুণ সাহসে ভূবনের দিকে গুলি করতে করতে অগ্রসর হয়। কিছুক্ষণ পর ভূবনের গুলিতে অন্য একজন আর্মি আহত হয়। কিন্তু ভূবনের অবস্থান এমন জায়গায়

যে, আর্মিদের গুলি কখনো ঐ জায়গায় পৌঁছে না। উভয় পক্ষের গোলাগুলির ডামাডোলে ভুবনের অবস্থান বুঝার আগে আর্মিদের এই ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হবার পরই তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন।

ভুবন বেষ্টনির মধ্যে থাকলেও তাকে জীবিত ধরা যাবে না বুঝতে পেরে আর্মিরা গ্রামের কার্বারী শ্রী রবিন্দ্র কার্বারীকে ধরে এনে ভুবনের নিকট পাঠিয়ে দেন ভুবন যাতে হাতিয়ারটা দেয়, বিনিময়ে তাকে প্রাণে রক্ষা করা হবে। রবীন্দ্র কার্বারী দুইবার গিয়েও ভুবনকে রাজী করাতে সক্ষম হননি। এরপর গ্রামের অন্য লোক দিয়ে চেষ্টা করেও আর্মিরা ব্যর্থ হন। ভুবন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন যে, সে শান্তিবাহিনী তাই সে স্যারেন্ডার করতে জানে না। আর্মিরা কয়েক ঘন্টা ধরে তাকে আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এরপর আর্মিরা উপয়ান্তর না দেখে প্রথমে অত্যন্ত নিকটে গিয়ে গুহার উপর থেকে ভুবনকে লক্ষ্য করে কয়েকটা গ্রেনেড ছুড়ে। কিন্তু তাতেও ভুবন নিহত না হলে একটা জিএফ দিয়ে তাকে হত্যা করে। ভুবনের দেহকে আর্মিরা বহন করে নিয়ে যায়।

মুলতঃ আর্মিরা তাকে জীবন্ত ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভুবন আর্মিদের কাছে কাপুরুষের মতো জীবন্ত ধরা দিতে রাজী ছিলেন না। জীবন দিয়ে ভুবন বীরত্বের পরিচয় দেয়। এই ঘটনার সাক্ষী রবীন্দ্র কার্বারী এখনো জীবিত আছেন। ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে। ১৬ বছর বয়সে ভুবনের যুদ্ধ করার কৌশল মহাভারতের ষোল বৎসরের বীর অভিমন্যুর যুদ্ধের কাহিনী মনে করিয়ে দেয়। আত্মসমর্পণ না করে একা ভুবন ৫০-৬০ জন আর্মির বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। বারবুনিয়া জোনের লেঃ খালেক এই হামলার নেতৃত্ব দেন।

গোটা লংগদু এলাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভুবনের বীরত্বকে এখনো শ্রদ্ধা ও গর্বের সাথে স্মরণ করে। মৃত্যুর আগে ভুবন তাদের অত্যন্ত প্রিয় আপন জন ছিল। এলাকার ছেলে হিসাবে সে সকলের পরিচিত ছিল। বিশেষতঃ ভুবনের নাবালকত্ব এবং দেবতুল্য চেহারার জন্য তার মৃত্যুতে গোটা এলাকার মানুষ শোকে বিহ্বল হন।

নিজের সবচেয়ে প্রিয় ও সম্ভাবনাময়ী সন্তানের মৃত্যুতে শহীদ ভুবনের মা ভেঙ্গে পড়েন। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা যখন ভুবনের বাড়ীর পাশ দিয়ে অস্ত্রহাতে সারিবদ্ধভাবে মার্চ করে যেতেন শহীদ ভুবনের মা নিজের ছেলের কথা স্মরণ করে অঝোরে কাঁধতে থাকেন। বহুদিন এভাবে চলার পর একদিন গ্রামবাসীরা আমাদের সেকথা জানালেন। তখন এভাবে কাঁদার সময় আমাদের কমান্ডার লেঃ অনুরূপ ভুবনের মায়ের কাছে গিয়ে দেশের জন্য ভুবনের আত্মত্যাগে তাকে না কেঁদে গর্ব করতে বললেন।

তিনি আরো বললেন আমরা ভুবনের হাজারো ভাই এখনো বেঁচে আছি এবং আমরা সবাই আপনার সন্তান। একথা শুনে শহীদ ভুবনের মা বললেন - "বাবা তোমরা যখনি যাও আমার বাড়ীতে না ওঠে যেতে পারবে না। আমার বাড়ীতে অন্তত পানি খেয়ে যেতে হবে। তোমাদের কাছে পেলে আমি যে শান্তি পাই। তোমরা যে দেশের জন্য কাজ করছো তার জন্য আমার মন গর্বে ভরে উঠে"। সেদিনের পর থেকে আমরা সবাই শহীদ ভুবনের ভাই হিসাবে তাদের বাড়ীতে না ওঠে কোথাও যেতে পারতাম না। শহীদ ভুবনের মা পাকা কলা, পাকা পেঁপে, বিনি ভাত কোন কিছুই আমাদের ফেলে খেতেন না। সকল শান্তিবাহিনীর মা শহীদ ভুবনের মায়ের হাতে পানি খান নাই এমন সদস্য ২নং সেক্টরে ছিল না। আমাদের যদি তার বাড়ীতে যেতে দেরী হয়ে যায় তিনি খবর পাঠাতেন। সকল শান্তিবাহিনীর মা শহীদ ভুবনের মায়ের স্বর্গীয় মমতায় আমরা নিজেদের মায়ের অভাব ভুলে যেতাম এবং বিপ্লবী জীবনের কাঠিন্যে ঘরোয়া জীবনের স্বাদ পেতাম। মায়ের ছেলের এই আদর-সোহাগের সম্পর্কের খবর গোপন না থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কানে পৌছে। তাই ১৯৮৫ সালের পর থেকে শহীদ ভুবনের মা ও বাবা ফেরারী হয়। মা ও বাবাকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় কিন্তু যার ছেলে অভিমন্যুর মতো বীর তার বাবা কম বীর হবে কিসে? বিভিন্ন সময় অপারেশন করে শান্তিবাহিনীর এই মা ও বাবাকে ধরা যায়নি। অবশেষে ১৯৮৯ সালে একরাতে করল্যাছড়ি ক্যাম্পের ৫০-৬০ জনের একদল আর্মি ঘেরাও করে মা ও বাবার ঘর। বাবা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও মা ধরা পড়েন। মাকে মারধোর করা হয়। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তিন দিন আটকে রেখে ও অত্যাচার করে ছেড়ে দেয়া হয় মাকে। আমাদের সেই মা ও বাবা শান্তিবাহিনীর মা-বাবা হবার কারণে এখনো বিভিন্ন দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য আন্দোলনে যেমন বিপ্লবীদের মা, মাসি, কাকা, মামা ইত্যাদি পরম সহায়ক বন্ধুর ভূমিকা দেখা যায় আমাদের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এদের সান্নিধ্য পেয়েছে। জুরছড়িতে আমাদের সেই নিপুণের মা, বসন্ত মোনের আজু (টিকিনি বুজ্যা), কাচলঙের জেলেই, খেগার আন্তারা ও কাক্কা জুম্ম জাতির আন্দোলনের ইতিহাসে ধ্রুবতারার মত জ্বলবে। এইসব পরম সহায়ক বন্ধুরাই তো বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের সঞ্জীবনী শক্তি ছিল।

◆

ক্যহলাউ ভান্তে-একটি রাজনৈতিক চরিত্র

তাতিন্দ্র লাল চাকমা

ক্যহলাউ ভান্তে পরলোক গমন করেছেন গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে। তিনি ছোটকাল থেকে ছিলেন প্রব্রজ্যাধারী সাধু পুরুষ যাতে ধর্মীয় উপাধিতে মহাস্থবির হন। লম্বা, স্বাস্থ্যবান চেহারার মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তার কিছুটা ছিল ব্যতিক্রম। শৈশবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরাক্রমশালী ঘটনাগুলো তাকে সাহসী মনের অধিকারী করে তোলে। কারণ রাঙ্গামাটিতে যখন বোমা ফেলা হয় তখন তিনি কৈশোর জীবনে পদার্পণ করেছেন। সত্তর দশকের শুরুতে তিনি মারমা সমাজের নানা সমস্যার প্রতি মনোযোগী হন। তারপর আরাকানের নানা বিদ্রোহী দলের সাথে গোপন পরিচিতি ঘটে। তিনি কয়েকবার বার্মায় গিয়ে সেখানকার ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার সাথে পরিচিত হন।

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে বান্দরবানে একদিকে রাজাকারদের তান্ডব অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ উভয় দিক থেকে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিশেহারা সশস্ত্র গ্রুপ গড়ে উঠে। তার পাশাপাশি পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি এ অঞ্চলে ব্যাপক সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে। এই অবস্থায় ক্যহলাউ ভান্তে প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর জনসংহতি সমিতিতে যোগ দেন।

এই সময়ে একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী ভূমিকা অন্যদিকে নব্য বিপ্লবী বাহিনী সর্বহারা দলের হঠকারী ভূমিকার মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সর্বহারা দল তার উপর নানা বাধা-নিষেধ আরোপ করে এবং তাকে আত্মসমর্পণের জন্য চাপ দেয়। তার পরে তারই আহবানে আমি (লেখক) ছোট্ট একটা সশস্ত্র গ্রুপ নিয়ে ঐ এলাকায় তারই নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সেই সময় থেকে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি থেকে আমাদের সংগ্রামী জীবন কাটিয়েছি। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে বহুদিনের স্মৃতিভরা দিনগুলোর কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেই আজ তাঁকে আমি স্মরণ করবো।

রাজনীতির অগ্নিপুরুষ শব্দটি আমি জেনেছি কিন্তু বাস্তবে সেটা দেখার সুযোগ ছিল না। এই শব্দের উদাহরণ আজ খুঁজি তাদের এই কয়েকজনের চরিত্রে। আজীবন প্রব্রজ্যাধারী অবস্থায় দেখেছি। শত সমস্যার মধ্যেও তিনি আমাদের সাথে হাঁটতেন। আমাদের সামরিক শৃংখলা দেখে তিনি মুগ্ধ হতেন, প্রশংসা করতেন। দেখেছি একের পর এক বিড়ি, সিগারেট পাইন্দু, তামাকের বড় বড় সিগারেট একটার পর একটা টানতে টানতে তার দিন রাত্রিগুলো চলে যাচ্ছে। চেইন স্মোকার শব্দটিরও একটা সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখলাম। কিন্তু আরও পরে দেখলাম নানা অভাব এবং সমস্যার মধ্যে তিনি হঠাৎ একদিন কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি ধুমপান করবেন না এবং তিনি শেষ দিনটি পর্যন্ত ধুমপান থেকে বিরত থাকলেন। ধুমপানে এতবড় আসক্ত লোক যেমন আমি আগে দেখিনি তেমনি এত দৃঢ়তার সাথে কঠোর সংযমের মাধ্যমে তাকে বর্জন করার উদাহরণও আমরা দেখতে পেলাম। আর দেখলাম মানুষ ইচ্ছা করলে নিজেকে পরিবর্তন কিংবা সংশোধন করতেই পারে। বিপ্লবী শিক্ষায় জেনেছি- লোহাকে আরো আরো পোড় খাইয়ে ইস্পাতে পরিণত করা হয়। কিন্তু মানুষের মনও যে ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তায় নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারে তার নজিরও দেখার সুযোগ হয় তার ঘটমান জীবন দেখে। তিনি কোনদিন সামরিক ট্রেনিং নেননি। তারপরও যুদ্ধে যাবার তার কি বুকভরা সাহস। সেই তরুণ বয়েসী আমাদের সাথে তিনি সত্যি সত্যি যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছেন এবং বিজয়ীর বেশে রাইফেল কাঁধে নিয়ে যতক্ষণ পারেন উৎসাহের সাথে হেঁটেছেন। কিন্তু বিপদ ও বিপর্যয়ের সময়?

একদিন রাইংখ্যং রিজার্ভের গভীর অরণ্যে সেই মহালছড়ির মৌনে আমাদের আস্তানায় শত্রু বাহিনী হঠাৎ হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে আক্রমণ করে। আমাদের জনৈক কর্মীর আত্মসমর্পণের পর পরিস্থিতিতে আঁচ-অনুমান করা হচ্ছিল শত্রুদের আক্রমণের সম্ভাবনা সর্বাধিক। তাই আমরা আসল শক্তি নিয়ে দুর্গম পার্বত্য খাদ ও পিচ্ছিল পথে এ্যাম্বুশ করে থাকি। আমরা নিশ্চিত শত্রু যেভাবেই আসুক তাদের খেসারত দিতেই হবে। কিন্তু না, ঘটনা ঘটেছে উল্টোভাবে। শত্রুরা পায়ে হেঁটে আসেনি। এসেছিল হেলিকপ্টার যোগে। কিন্তু ক্যহলাউ ভান্তেকে আমরা পিছনের নিরাপদ আস্তানায় রাখলেও শত্রুরা ঠিকই চিহ্নিত করতে পেরেছিল। ঐ হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে পাশের পাড়াতে তারা মুহুর্মুহু ব্রাশ ফায়ার করতে থাকে। তখন ভান্তের সাথে যারা ছিল তারা হয় অসুস্থ না হয় যুদ্ধে অনুপযোগী লোকজন। তখন ভান্তেসহ অন্যরা নিজ আস্তানা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। সময়টা ছিল শীতকাল। ভান্তের দলের সাথে ছিল লাল রঙের লেপ। ঐ লেপ দেখে শত্রু বাহিনীর টার্গেট নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তারপর উত্তর দিকে যাবার সময় একবার আর দক্ষিণ দিকে যাবার সময় একবার ব্রাশ ফায়ার করতে করতে ঐ দলটা চিলের ভয়ে মুরগীর ছানার পালাবার যেই অবস্থা ঠিক সেই রকমই হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের সময়ের সৌভাগ্যেরও উদয় হয়। হঠাৎ ভান্তে বড় একটা আলুর গর্তে পড়ে যান। সেই আলুর গর্তটাও (জঙ্গলী আলু মাটি খুঁড়ে আহরণ করা হয়) এমনই বিরাট যে ঐ গর্তে ভান্তে অনায়াসে তো ঢুকে গেছেনই আর গভীরতাও পুরো এক মানুষ। অতএব, ঐ গর্তই তার নিরাপদ আশ্রয় হয়ে যায়। আর অন্যদের বড় বড় গাছের আড়ালে লুকোতে কোন অসুবিধা হয়নি। গহীন জঙ্গল, তাই হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার কোন সুযোগও ছিল না। আর হেলিকপ্টার অনির্দিষ্ট কাল ধরে উড়তেও পারে না। তাই হেলিকপ্টারটাকে ব্যাক করতে হয় এবং ভান্তের দল বেঁচে যায়। কিন্তু রীতিমত সমস্যা দেখা দেয় ভান্তেকে ঐ গর্ত থেকে তুলে

আনতে। যাই হোক, বিকেলে যখন আমরা সবাই মিলিত হই-তখন দুঃখের মধ্যেও হাস্যরসের একটা খোরাক আমরা পেয়ে যায়।

আরও একদিন তাকে আমরা বিপদে পড়তে দেখি। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। প্রচন্ড খরস্রোতা রাইংখ্যং খালের উপর দিয়ে বাঁশের ভেলা দিয়ে গোটা কোম্পানীটা স্থানান্তর হচ্ছিলাম। জলস্রোতের প্রচন্ড ধাক্কায় আমরা যখন বিদ্যুৎ গতিতে চলছিলাম তখন পানির কুলুকুলু শব্দ এমনভাবে শোনা যাচ্ছিল যে আমাদের অগ্রবর্তী দল শত্রুর মুখোমুখী হয়ে প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে উপর্যুপরি ব্রাশ ফায়ার করছিল তা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। পরে যখন কয়েকটা মোটারের গোলা এসে আমাদের মাথার উপরের পাহাড়ে প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয় তখনই আমরা বুঝতে পারি যে আমরা ততক্ষণে কত বড় বিপদে পড়ে গেছি। তবে দিশেহারা না হয়ে স্রোতের টানের বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রচেষ্টায় আমরা ভেলাগুলো কূলে ভিড়াতে সক্ষম হই। কূলে উঠেই প্রথমে অসুস্থ কর্মীদেরকে এবং ক্যহলাউ ভান্তেকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করি। আমাদের একটা দল অগ্রবর্তী গ্রুপকে সাহায্য করতে যায় আর অন্য একটা দল আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র জঙ্গলে লুকোবার চেষ্টা করে। ক্যহলাউ ভান্তেরা ততক্ষণে কিছুদূর যেতে না যেতে একটা বিরাট পিচ্ছিল পাথরে (স্থানীয় ভাষায় চাদারা) আটকে পড়েন। ঐ চাদারাটা দৈর্ঘ্যে একশ ফুটের মত হবে। ঐ পাথুরে পথটা এতই পিচ্ছিল যে পুরো পা দিয়ে ভর দেয়ারও সুযোগ নেই। শুধুমাত্র পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপরে ভর দিয়েই চলার সুযোগ। আর ঐ পথের ডানে কিংবা বামে যাবার কোন সুযোগ নেই। খাল দিয়ে উজানী যাবারও কারোর কোন রকম সাধ্য নেই। নীচের দিকে গেলে শত্রুর সামনে পড়তে হবে। আর ঐ খাড়া পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে পুরো একটা দিন লেগে যাবে। অথচ ঐ একশত গজ পথ পার হতে পারলে নিজেরাও নিরাপদ হতে পারে। ক্যহলাউ ভান্তে সচরাচর ঐ পথে হাঁটতেন না। কিন্তু সেদিনের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাও ছিল না। অতএব, নির্দেশ দিলাম ঐ পথে যেতে হবে। তখন ভান্তের জন্য অগ্নি পরীক্ষা নাকি কি পরীক্ষা বলা যাবে তা জানি না। তাদের ষোলজন থেকে তিনজন পার হয়ে গেছে। তারপর ভান্তে যাচ্ছেন প্রচন্ড মনোবল নিয়ে। কিন্তু মাঝপথে গিয়ে সামান্য গা ঝাঁকানি দিয়েই উনি আস্তে করে বসে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে বললেন-"ভান্তে মারা গেছে"। (তিনি নিজেকে ভান্তে বলেই বলতেন) এবং চোখ বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করলেন। দেখা গেল তিনি সম্পূর্ণ মনোবল হারিয়ে ফেলেছেন। বসলে কি হবে পুরো পায়ের উপরও তো ভর দেয়াই সম্ভব হয়নি; কাজেই ইতিমধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। নীচে পড়লে দেড়শত গজ পাথরের পথ গড়িয়ে পড়ার আগেই অক্কা পেয়ে যাবে। পিছনে যাবারও কোন সুযোগ নেই। দুর থেকে দেখে চীৎকার করে বলেছি- তোমরা কেউ একজন ভান্তেকে হাত ধরে টেনে নাও। পড়ে গেলেও এদিকে আমরা ধরবো। কাজেই ভয়ের কিছু নেই। ভান্তের ছিল আমার উপর প্রচন্ড ভরসা। তারপর তিনি কান্না থামিয়ে চোখ মেলে তাকালেন-আহলা মারমা নামে একজন মাঝবয়সী কর্মী হাত বাড়িয়ে বললো, "এই হাতটা ধরেন, কোন অসুবিধা হবে না ভান্তে। পড়ে গেলেও আমি ধরে রাখতে পারবো"। তার কথায় এতই দৃঢ়তা যে ভান্তে কিছুটা নির্ভর করে হাতে ধরলেন। কিন্তু বাস্তবটা এমনই যে, একজন পড়ে যাবার অর্থ দু'জনেরই নিশ্চিৎ মারা যাওয়া। তবুও মানুষের মনোবল, মানুষের উপর মানুষের আস্থা কি প্রচন্ড শক্তি যোগাতে পারে। ভান্তে ঐ হাতটা ধরে শেষ পর্যন্ত পার হতে সক্ষম হলেন। আমরা প্রায়ই ঐ রাস্তাটাকে মজা করে বলতাম, ঐ পথটা হচ্ছে মার্ক্সবাদী পথ। ঐ পথ থেকে ডানে কিংবা বামে যাওয়া যাবে না। পিছনে ফেরাও দুঃসাধ্য। এক জায়গায়ও স্থির থাকা যাবে না শুধুই সামনে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। তাই আমরা রসিকতা করে বলতাম, বামপন্থী, ডানপন্থী, রক্ষণশীল কিংবা পশ্চাৎপদতা কোনটাই এ পথে চলে না। কাজেই এটা একটা মার্ক্সবাদী পথ।

যাই হোক, ভান্তের দুঃসময়ের দিনগুলো যেমন আমরা দেখেছি তেমনি যাবতীয় লোভ-লালসাকেও বর্জন করতে আমরা দেখেছি। তিনি যখন মারা যান তার সম্পত্তি বলতে কিছুই হিসাবে পেলাম না। তার স্ত্রী-পুত্র নেই, একটা বাড়ীও তার নেই এমনকি তাকে কবর দেয়ার একখন্ড ভূমিও নেই। যেই গাইন্দ্যাতে ভান্তেকে আমি '৭৪ সালে দেখা পেয়েছি সেই গাইন্দ্যাতেই তার মৃত আত্মাকে দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে-গৌতম বুদ্ধের যে বাণী "ত্যাগই শান্তি"- তিনি ত্যাগী হতে পেরেছেন। অতএব, শান্তিতেই হয়তো মারা গিয়েছেন।

যেই পার্বত্য রাজনীতিতে এযাবৎ দেখা গেছে শুধুই আপোষ। শুধুই স্বার্থপরতা। তাই এই জাতির ভাগ্যেও কিছুই জোটেনি। যেই পার্বত্য জুম্ম নেতৃত্ব এক সময় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রস্তাবিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সিদ্ধান্তকেই রাজনৈতিক সমাধান হিসেবে মেনে নিয়েছিল সেই নেতৃত্বের সমাজে ক্যহলাউ ভান্তের মত একজন নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও সাহসী নেতৃত্ব শুধু বিরলই নয় রীতিমত অকল্পনীয় চরিত্র। পার্বত্য রাজনীতিতে আগাগোড়া যে 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল পলিসি' প্রয়োগ হয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছিল মারমা উন্নয়ন সংসদ, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংসদ, চাকমা উন্নয়ন সংসদ, বোম কমপ্লেক্স, মুরুং কমপ্লেক্স ইত্যাদি ইত্যাদি কত সাম্প্রদায়িক মন্ত্র পার্বত্য সমাজকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছিল সেই যুগে ক্যহলাউ ভান্তে সমগ্র নির্যাতিত, নিপীড়িত জুম্ম জাতিগুলো ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সুমেরুর মতই অটল ও দৃঢ়।

রাজনীতিতে ত্যাগী নেতার জন্ম হওয়া একটা জাতির জন্য কতটা প্রয়োজন তা আজো হয়তো মূল্যায়ন করতে পারবো না। তবে এই ক্যহলাউ ভান্তের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতা, পরমত সহিষ্ণুতা জুম্ম জাতির ঐক্য গঠনে তার অবদান এই জাতি যতই সচেতন হবে, ততই তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দেবে। তাই আমি মনে করি ক্যহলাউ ভান্তের এই রাজনৈতিক চরিত্র একটা অনুকরণীয় আদর্শ। জাতি তার এই চরিত্রকে নিয়ে গর্বই করতে পারে।

◆

কবিতা

জাতির চেতনা

পহেল চাকমা

কখনও কি ভূলিতে পারি
তোমার চিন্তা চেতনার কথা।
সমগ্র জুম্ম জাতির মাঝে তাই
আজো তোমাকে হারানোর ব্যথা।
জানিনে আমাদের মাঝে আর কখনো জন্ম নেবে কি-না
তোমার মতো মহান নেতা?
বিপন্ন, লুণ্ঠিত, বিভক্ত জুম্ম জাতিকে
করতে একতা।
তুমি চির অম্লান, তুমি চির মহীয়ান,
তুমিই আমাদের অনুপ্রেরণা।
তুমিই আমাদের জাতির চেতনা
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।
১৯৮৩ ইং সনের ১০ই নভেম্বর,
বেঈমান, বিশ্বাসঘাতকেরা নিল কেড়ে জাতির চেতনাকে
তবু দমিয়ে রাখতে পারবে না,
তাঁর চিন্তা, চেতনা ও মতাদর্শকে।

উত্তরসূরী

উ উইন মঙ জলি

মঞ্জু, তোমার চেতনায় মশাল নিয়ে রাজপথে
মিছিলে যাবো বলে পা বাড়ালাম।

তাই ওরা বর্বরতা আর অন্ধকারের প্রতিনিধিরা
মীর জাফরী মূর্তি হয়ে হনন করে নিলো তোমাকে।
রোধ করলো সবচেয়ে সুরেলা শিল্পীর কণ্ঠ
পাড়লো না শুধু ঘুম জাগানিয়া সুর মুছে দিতে।

মঞ্জু, তোমার সেই জাগানিয়া গান আজ
প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিটি গিরিমালায়।
তোমার শোক মিছিল থেকে জেগে উঠে
শত-সহস্র জুম্ম, নব উদ্দীপনায়।

মঞ্জু, তোমার চেতনায় মশাল রাঙিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে
সকল বাঁধা উপেক্ষা করে, দেখো ওই আসছে
তোমার উত্তরসূরী দল, দৃপ্ত পদক্ষেপে।

সে একজন

পারমিতা তংচঙ্গ্যা

রাইংখ্যং, চেঙ্গী, মাইনী, কাচালং নদীর তীরে
গড়ে উঠা সমৃদ্ধশালী বসতি, পাহাড়, নদী
অরণ্য ছিল আমাদের সঙ্গী। প্রকৃতিও ছিল
বন্ধুর মত, হেমন্তের পাকা ধানের ম-ম গন্ধে
ভরে থাকত মাঠের পর মাঠ। ছড়াতে মাছ
কাঙারা, ইজে, সিলোন আরও কত কি!
প্রত্যুষে রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে চলে যেত,
যেন বা সুউচ্চ পাহাড় পেরিয়ে! রাখালের বাঁশির সুরে-
আবেশে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসত অলস দুপুরে।
গ্রামের পর গ্রামে আনন্দো"ছল কোলাহল, এক উৎসবের
রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয় নতুন উৎসব!

শকুন যেমন মৃতদেহের পানে তাকিয়ে থাকে লোলুপ দৃষ্টিতে
শাসকরূপী শকুনেরাও দৃষ্টি দেয় সমৃদ্ধশালী জনপদে,
শুর" হয় বিদ্যুৎ, শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে
বাঁধ নির্মাণ, তাদের কাছে অসহায় মানুষের বসতভিটা
হারানোর আকুলতা পৌছায় না - সমৃদ্ধশালী গ্রাম নিমিষেই
তলিয়ে যায় অতল জলের গহ্বরে। খড়-খুটোর মত ভেসে
যায় বিশাল মাটির দালান, কাঠের বাড়ী, বাঁশের মাচাং!

একজন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল শকুনদের বিরুদ্ধে
শকুনেরা বড় চালাক! ধরে তাকে পুরল জেলে-
তবুও দমেনি সে। শুরু হয় নতুন ইতিহাস-
মুখের আদল বুঝিই শুধু যায় বদলে, কার্যকলাপ বদলায় না
সে একজন আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়; মাটির পিদিম নিয়ে
হাজির হয় অধিকার বঞ্চিতদের পাশে। মাটির পিদিম-
আলাদিনের চেরাগ হয়ে আমাদের সব দুঃখ মোছাবে।
সহসা নিজেদের মাঝে ওঠা শকুনের দৃষ্টি পড়ে-
তার বুক ঝাঁঝরা করে দিতে তাদের হাত কাঁপেনি
একটুও, সে একজন হাসিমুখে বরণ করে নেয় মৃত্যুকে।
নিজের রক্ত দিয়ে মাটির পিদিমে তেল দিয়ে গেলেন-
কোনদিনও যেন নিভে না যায় এই প্রদীপ্ত পিদিমের
শিখা। আত্মত্যাগী সে একজন-
প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

জুম পাহাড়

তনয় দেওয়ান

আমাদের কিছু কিছু বন্ধুর পিঠে এখনো নির্যাতনের দগড়া- দগড়া দাগ
ফুটে আছে
অতীতে আমাদের বাধ্য করা হতো গুচ্ছগ্রামে থাকতে মানবেতরভাবে।
আর তারা তখন আঙুলের মটকা ফোটাতো- আমাদের
প্রাত্যাহিক জীবনের কষ্টগুলো দেখে বীভৎস আনন্দে মেতে।
তখন আমরা যুদ্ধ করেছি- তোমাকে সর্বদা অগ্রগণ্য রেখে।
সংকীর্ণতা ফেলে জাতীয়তার সীমা ভাঙার জন্যে।
খর রৌদ্রে খড় বিছানো আইলের পর আইল ফেটে যাওয়া মাঠে
আইলহীন যৌথ খামার আর সবুজ ফসলের জন্যে।
মসজিদ, উপজাতি আর বাঙালীর বদলে
ধর্মনিরপেক্ষ, জাতি আর বাংলাদেশী হবার জন্যে।

আমরা জানি- তোমাকে ছাড়া পল্লবিত হবে না এখানকার বৃক্ষরাজি
যেখানে আমরা সমর্পিত হব, ঐক্যবদ্ধ হব সেখানে তোমার উপস্থিতি;
কেননা তোমার চিন্তাধারাই যে ঐক্যের আর সংগ্রামের পথ রচনা করেছে।
আমরা ভেবেছি-
আমাদের না দেখা প্রীতিলতার মুখ দেখেছি কল্পনাতে
দেখেছি তাতে আত্মত্যাগের মৃত্যুসুখ।
আর
আমাদের না দেখা ক্ষুদিরামের ফাঁসি দেখেছি অমর বিকাশে
দেখেছি তাতে অমরত্বের হাসি।

আমাদের জুম পাহাড়গুলো এখনো কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায়নি;
হাড় কাঁপানো শীত এখনো জেঁকে বসেনি অনাবৃত শিশুর শরীরে।
তবুও এখানে-
জীবন মানে কচি কচু পাতার পানির মতো
নিমিষেই যায় গড়িয়ে। তারপর -
দীর্ঘ আর তীব্র কষ্টের বাতাসে দাপাদাপি,
ছোটাছুটি প্রানান্তকর। পুরুষানুক্রমিকভাবে
পিচ্ছিল আর অন্ধকারের পথ হাতরিয়ে।

সবুজ পাহাড়ের কোলে বসে স্বপ্ন দেখেছিল যে যুবক- একটি নতুন
সমাজের
তার সিকি অংশও বিনির্মিত হয়নি এখনো। তার বদলে এখানে-
স্বপ্ন ভাঙার ভ্রাতৃঘাতী লড়াই চলে নিত্য প্রতিদিন।
যেন স্বপ্ন ভাঙার দলে মেতে উঠেছে সবাই।
অতঃপর
আবার নতুন স্বপ্নের ঘোরে কান্ত যুবকের দল মিছিলে যায়
চেঙ্গী- কাচালং-শলক- রেইংখ্যং স্রোতের মতো;
ঐক্যবদ্ধ হয়, বিলীন হয় কাপ্তাই হ্রদে এসে ।
যেভাবে পাহাড়গুলো মিশেছে একে অপরের সাথে।
কিন্তু উল্টো দখিণা হাওয়ায় নদীগুলোর স্রোতকে ঠেলে নিতে চায়-
ঢেউগুলো বিভ্রান্ত হয়, গুড়িয়ে যায় একে অন্যের টানে
জুম পাহাড়ের স্বপ্নহীন যুবকের মতো।

মনে পড়ে

অরুমিতা চাকমা

জট পাকিয়ে হন হন করে কালো মেঘ যখন
হেঁটে যায় আকাশের বুকে,
হালকা কালো মেঘে যখনই ঢাকা পড়ে চাঁদ
তখনই আমার মাধুরীভরা হৃদয়ের সুন্দর বাসনাগুলো
প্রচন্ড এক ঢাক্কা মেরে প্রতারণা করে চলে যায়।

সূর্যের আলো আলসেমি সেজে যখনই আমাকে শোয়ায়,
মনে পড়ে এক কালো রাতের বিভীষিকাময় অনলের শিখা!
কুৎসিত, মন্দকথা আর নির্মম অত্যাচার
সেই তীব্র সাড়া জাগানো ঘটনার ফাঁকে
হাজারো মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়া শিশুর আর্তনাদ।
মনে আছে স্পষ্ট আজও
সেই নিঃশেষিত নোংরা পরিবেশ আর দুঃখ-কষ্টের বন্দীদশা।

যখনই দেখি জ্যোস্নার আলো ঝাপসা হয়ে গেছে
মনে পড়ে লোহার শিকলে বাঁধা কান্না কাতর গ্রামবাসীদের
অত্যাচার, লুৎপাত, অপহরণ আজও থামেনি।
সেই বেদনাবিধুর যন্ত্রণা আর বীভৎস সন্ত্রাস
কেড়ে নেয় অন্তরাত্মা!
হারিয়ে যাওয়া সবুজ শ্যামল পাহাড়
আর নর নারীর প্রাণে ছুঁয়ে যাওয়া মুক্তির নিশান ফিরে পাবো কি?
নীল গগণে যখনই মেঘ জমা হয়
তখনই আমার হৃদয়ে একে একে সব মনে পড়ে।

বম ভাষায় রচিত কবিতা

লাল থং সাং বম

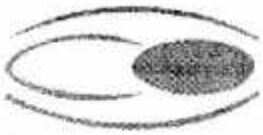

তালাং

কান্‌নিচো তালাং মি
তালাং-আ কান্ উম
কান্‌একতেহেন রেম তাক হেনকান্ উম
কান্‌একতেহেন লাও কান্‌তুআহ্
তালাংচু কান্‌সা উমনাক্।
হি-না আউখম থিন থক নাক উম লাউ
নুয়াম তাক হেন কান্ উম
কান্‌নিচো কান্‌একতেহেন কান্‌কমদুধ
উ! তালাং কান্‌নিচো নাক্‌লাক আ কান্ উম-মি
মেতে মেতে লাইতোম পুন।
কান্‌একতেহেন তাউ ইন আ
কান্ তাউলে কুয়াক কান্‌জুক।
পার দাং দাং চমপার না-নেই
আ-দ-মিরেই চমপার টাচু
থা-দি-বো হেন কান্ তাউলে
নাং লাক আ কান্ মু
হি-লে কাং-লে-খি লেকাং তি-তালাং।
না-চে ওয়াল তালাং
নাং লাউচুন কান্‌নিচো মিত্তাকটা
নাং লাক আ কান্ তং
ডান আ-মি হয়তে নুয়ামনাগ।
নাং লাক কান্ উম চুন
কান থিন লুং লাক-আ আনম মিজং
হং থিয়াং হেন্।
তালাং না-ধ মিরেই
নাং চু-না-ধ মিরেই।

পাহাড়

(অনুবাদ)

আমরা পাহাড়ী
পাহাড়ে করি বসবাস,
সবাই আমরা মিলে মিশে থাকি,
সবাই করি জুম চাষ।
পাহাড় হলো আমাদের ঠিকানা
এখানে কেউ কারোর শত্রু নয়
সুখে দুঃখে থাকি,
সবাই আমরা বন্ধু।
ওহ! পাহাড়, আমরা তোমার বুকে করি বসবাস
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এগার জাতিসত্ত্বা।
সবাই আমরা বৈঠক ঘরে জড়ো হয়ে
টান দিই হুক্কা।
তোমার মাঝে ফুটে থাকে
কত রঙ বেরঙের ফুল।
ক্লান্ত দেহে তোমার বুকে বসে
তাকিয়ে থাকি নদীর একুল- ওকুল।
কী মধুর পাহাড় বিচিত্র তোমারি রূপ
তোমাকে ছাড়া আমরা অসহায়
তোমার মাঝে আমরা যেন
সুখের স্বর্গ খুঁজে পায়।
তোমার বুকে থাকলে
মুছে যায় আমাদের গ্লানি- অপমান
তোমার দিকে তাকালে মনে হয়
তুমিই যেন পাহাড়ীর প্রাণ।

তাদের স্মরণে

ল্যরা চাকমা

সূর্যের ঝকমকে আলোতে,
এলো আবার ১০ নভেম্বর তার সাথে।
কুয়াশায় ভরা প্রভাতে সবারই ঝরছে বেদনার অশ্রু।
এদিন দিয়ে গেছে প্রাণ-
মহান নেতা এম এন লারমা ও তার সঙ্গীরা
জুম্ম জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করলো এরা।
তাদের লাল রক্ত চলেছে বয়ে
এখনো আমাদের দেহে,
সমগ্র জাতি হয়েছে ধন্য
তাদেরকে পেয়ে।
আজ যদিও তারা মৃত
চিরদিন অমর হয়ে রবে,
তাদের মত মহান জুম্ম জাতির মাঝে
জানি না, আর কবে জন্মাবে।
একরাশ বেদনা নিয়ে
যখন আসি ফুলের মালা পরাতে,
মনে পড়ে সেই দিনটি
রক্তে ভেজা তাদের দেহকে।
হত্যাকারী চার কুচক্রী প্রকাশ, দেবেন, পলাশ, গিরি
এদের আমরা কিভাবে ক্ষমা করি?
জুম্ম জাতির শত্রু, মানুষের শত্রু এরা,
এদের ক্ষমা করতে পারি না আমরা।
যারা দিয়ে গেলো প্রাণ, তারা থাকবে অমর হয়ে,
জুম্ম জাতির চোখ ফুটলো তাদের পেয়ে।
জাতির জন্যে দিয়ে প্রাণ তারা হয়েছে ধন্য
কিন্তু তারা নেই আজ, এ যেন মহাশূন্য।

মন্তব্য প্রতিবেদন

খাগড়াছড়িতে এবারের সংসদ নির্বাচন

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ

১লা অক্টোবর ২০০১ইং অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী ৮ম সংসদীয় নির্বাচনে খাগড়াছড়ির নির্বাচনটি ছিল বিগত যে কোন সময়ের তুলনায় একটু ভিন্নধর্মী এবং তাৎপর্যপূর্ণও। নির্বাচনের আগে নানা ধরনের কুটচাল দেখা গেলেও মূলতঃ চারদলীয় জোটের প্রার্থীর বিজয় ছিল অবধারিত। কিন্তু তারপরেও খাগড়াছড়ির আর্থ-সামাজিক চরিত্র দারুণ মজার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

চশমা মার্কা নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা। তার সহযোগী ছিলেন শ্রী সমীরণ দেওয়ান, শ্রী প্রবীণ চন্দ্র চাকমা, শ্রী শুভমঙ্গল চাকমা, শ্রী অনিমেষ দেওয়ান, শ্রী নির্মল কান্তি দাশ, মারুফ সাহেবসহ বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি। শুরুতেই তাদের উদ্যোগ তৎপরতা ছিল বেশ লক্ষ্যণীয়। এযাবৎ বাবু উপেন্দ্র লাল চাকমাকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। কিন্ত তার সবচাইতে বড় সম্বল ছিল ৬৪ হাজার ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীর সমর্থন। তদুপরি হিন্দু সমাজের ও আওয়ামীলীগের একাংশের নেতা নির্মল বাবুর সমর্থন এবং জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীরণ বাবুর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি - সবকিছু মিলে হিসেবের অংক বেশ শক্তই ছিল। যাই হোক নির্বাচন হলো, ফলাফল পাওয়া গেলো ঐ জোটের মোট ভোট সংখ্যা একহাজার তিনশত মাত্র। শোনা যায় তাদের নির্বাচনী ব্যয় হয়েছে মাত্র ১২ (বার) লক্ষ টাকা। এখন অনেকে শখ করে হিসেব করে দেন প্রতিটি ভোটের দাম কত পড়েছে। তাহলে কি খাগড়াছড়িতে ভোটের দাম এত বেড়ে গেল! নির্বাচনে কত শংকা, কত আশা, কত হিসাব, সবই কি ভুল?

শরণার্থীদের অপর নেতাদের এখন প্রশ্ন - উপেনবাবু এত টাকা খরচ করলেন কিন্তু পেলেন কোথায়? শরণার্থী কল্যাণ তহবিলের টাকা খরচ করেননি তো? এই প্রশ্ন ও সংশয় নিয়ে উপেনবাবুর ভবিষ্যতের দিনগুলো এগিয়ে আসছে। অধিকাংশরাই মনে করেন উপেন বাবুর নির্বাচন না করাই ভালো ছিলো।

এবারের নির্বাচনে বেশী আলোচিত হয়ে এসেছেন মিঃ প্রসিত বিকাশ খীসা। তিনি ভোটে জিতেননি, হেরেছেন বিপুল ভোটে। কিন্তু চমক লাগিয়ে দিয়েছেন বহু মানুষের মনে। সম্ভবতঃ এটাই তার কৃতিত্ব এবং তিনি চেয়েছেনও তাই। কারণ তিনি ৬ বছর খাগড়াছড়ির বাইরে থেকে এই প্রথম নির্বাচনের সময়ে এসে পদার্পণ করেছেন। অনেকে তাকে একনজর দেখতেও এসেছিল। আর তার জনপ্রিয়তা দেখাবার সে কি মহা উদ্যোগ! তার সামনে পিছনে পুলিশ, আর্মী প্রহরা, ঘটা করে স্কুলের ছেলেপেলেদের এনে নির্বাচনী শো ডাউন করেছেন। পত্র-পত্রিকার প্রোপাগান্ডাও ব্যাপক। মনে হয়েছে, সে হাসিনা-খালেদার চেয়েও বেশী গুরুত্বের ব্যক্তিত্ব। ডিসি ও ব্রিগেড় কমান্ডারের সাথে একান্তে আলোচনাও করলো। সবই ঠিক। কিন্তু সেই ডিসি, এসপি, ব্রিগেড কমান্ডারেরা চান একজন বাঙালী এমপি হয়ে আসুক। কিন্তু তারপরও প্রসিতকে এত কদর, এত নিরাপত্তা, এত তার উচ্চ প্রশংসা। এসবের রহস্য রাজনৈতিক সচেতন মহল আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কৃতিত্বের সাথে দাবী করে তারা প্রসিতকে বাইরে নিয়ে আসতে পেরেছে। এটা তাদের একটা Great achievement। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইঙ্গিত করেছে প্রসিত নির্বাচনের কয়েকদিন আগে নির্বাচন থেকে সরে গিয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থী শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমাকে সহযোগিতা দেবে। কিন্তু সচেতন রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চাল দিয়েছে ফলে প্রসিত শেষ পর্যন্ত নির্বাচন থেকে সরে যায়নি। তারপর নির্বাচনী দিনে কল্পরঞ্জনকে আক্ষেপ করে বলতে শোনা গেছে "এই প্রসিত্যা বেঈমানী করে আমাকে শেষ করে দিলো।" নির্বাচনী নাটকে মানুষ লক্ষ্য করলো কতো ধরনের ভন্ডামী এই মঞ্চস্থ হয়েছে।

অপরদিকে জনসংহতি সমিতি চুক্তি মোতাবেক ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবীতে ভোট বর্জনের ডাক দিয়েছে। তার চ্যালেঞ্জ সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে। তাই সরকারের যাবতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র, পুলিশ, বিডিআর, আর্মী, জেলা প্রশাসন, যাবতীয় প্রচার মাধ্যম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো তাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রয়োজন ছিল দাবার গুটি। এদিকে প্রসিত খুঁজছিল এমন একটি সুযোগ যে সুযোগে তার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারবে। তাই সে প্রথমে উপেনবাবুর হাত ধরে দাঁড়িয়েছে। পরে কল্পরঞ্জনের রথে চড়ে যুদ্ধ যাত্রা করেছে। পরে আর্মী-পুলিশের আদর আপ্যায়নে নির্বাচনী লড়াইয়ে মাওসেতুং বেশে তীর ধনুক উচিয়ে যুদ্ধে নামে। কিন্তু তার তীর ধনুকের লক্ষ্যবস্তু কি? সাথে আছে আর্মী-পুলিশ। তাহলে মারবে কাকে? লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করল। নিরীহ জনগণের ভোট ডাকাতি করে নিজেদের মিথ্যা সস্তা জনপ্রিয়তা দেখাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ফলাফল? নির্বাচন শেষে প্রসিত হেরে গেল। ব্রিগেডিয়ার বলল "প্রসিত তোমাদের অস্ত্রগুলো বের করো না। করলে অসুবিধা

হবে।" তারপর প্রসিত বিএনপি'র বিজয়ী প্রার্থী ওয়াদুদ ভূঁইয়ার আশীর্বাদ পেতে যায়। এরপরে চুপিসারে প্রস্থান করে। কিন্তু তার তীরধনুক প্রস্থান করলো না। শুরু হলো তাদের আসল টার্গেটের আক্রমণ।

প্রথমেই কমলছড়িতে কেন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছো এই অজুহাতে কালাধন চাকমা (প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক) সহ কয়েকজনকে মারধোর করে এবং কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে বীরবাহু চাকমাকে আহত করে। এরপরে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে নিরীহ ত্রিপুরা জনগণ ও অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকে নির্বিচারে বহুগুণ বাড়িয়ে চাঁদা তুলতে শুরু করে। প্রতিটি কলাছড়া থেকে ৫টাকা হারে এবং প্রতি লাকড়ী বোঝা থেকে ৫ টাকা হারে জোর করে চাঁদা তুলে এবং বলে যে তোমরা কেন তীরধনুক মার্কায় ভোট দাওনি সেজন্য তোমাদেরকে কয়েকগুণ চাঁদা দিতে হবে। কারণ ঐ নির্বাচনে তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে। এরপর সশস্ত্র অভিযান শুরু করলো হরিনাথ পাড়ায়। নিরীহ গ্রামবাসীদের মারধর করে চরম আতংক সৃষ্টি করে। আর মহালছড়িতে বেশ কিছু লোকজনকে অপহরণ করে মোটা অংকের টাকা আদায় করে। যারা টাকা দিতে পারেনি তাদের কাউকে কাউকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় করে দিয়েছে। তাতেও ক্ষান্ত হলো না। মহালছড়িতে তীরধনুক মার্কায় ভোট না দেওয়ার কারণে হিন্দু সমাজের দূর্গাপূজায় ব্যবহারের জন্য তোলা টাকা থেকে দুই লক্ষ টাকা দাবী করে। তারা এক লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এতবড়ো সামাজিক উৎসবে বাঁধা পেয়ে দারুণভাবে মনক্ষুন্ন হয়ে পড়ে তারা। তাই তারা প্রতিবাদে দূর্গাপূজা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ প্রশাসন এবিষয়ে অবোধ শিশুর মতো আচরণ করছে। এতক্ষণে জনগণ বুঝতে পারলো তাদের তীর ধনুকের আসল লক্ষ্যবস্তু কে বা কারা? তারা হচ্ছে দুর্বল নিরীহ জনগণ ও জনসংহতি সমিতির সদস্যবৃন্দ। তাই জনগণের মুখে মুখে শোনা যায় - ইতিপূর্বে আর্মী ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে কখনো গপ্রক (গুক্কুরুক) বাহিনী, আঙুল বাহিনী, কখনো মুখোশ বাহিনী দেখেছে কিন্তু শান্তি চুক্তির পর দেখতে পাচ্ছে সর্বাধুনিক মুখোশ বাহিনী। যাকে কোথাও প্রসিত বাহিনী, কোথাও গুন্ডুষ বাহিনী নামে আখ্যায়িত করে চলেছে।

বিগত নির্বাচনে জনগণ নানা নাটকের মঞ্চায়ন দেখলো, দেখলো আধুনিক দালালদের নতুন নতুন রূপ। কেউ মৃগী রোগীর মতো, কেউবা মতিভ্রষ্ট রোগীর মতো নানা অঙ্গভঙ্গী করছে। নানা ভাষায় কতো মিষ্টি মাখা সুরে বসন্তের কোকিল হয়ে সুরেলা কণ্ঠে বাণী শুনিয়েছে। কিন্তু জুম্ম জনগণ অসহায় - তীর ধনুকের লক্ষ্যবস্তু। জুম্ম জনগণের সচেতন অংশটি তামাশা করে এই তীর মার্কা বাহিনীকে বলতো 'দেবদত্ত'। কারণ সিদ্ধার্থের আমলেই দেবদত্তের তীর ধনুক হাতে বিরোধীতা করার ধর্মীয় মত প্রচলিত আছে।

এই চুক্তি বিরোধী দালাল চক্রটি একসময়ে যখন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সাধু শয়তান শ্রী অনন্ত বিহারী খীসা খুব জোরের সঙ্গে দাবী জানান যারা নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের ডাক দিয়েছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার। তত্বাবধায়ক সরকার চাচ্ছিল এধরনের একটা জনমত গড়ে উঠুক। তাই তাদের কণ্ঠ দিয়ে প্রথম ঐ বক্তব্যটি উপস্থাপন করে। অথচ বাংলাদেশে নির্বাচন বর্জনের অনেক নজির আছে। তারপরেও বিভিন্ন বক্তব্যে ও বিবৃতিতে তারা আঞ্চলিক পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত করার দাবী জানায় এবং জেএসএস নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবী জানায়। উল্লেখ্য বিষয় যে, জুম্ম জনগণ যেখানে এক বাক্যে স্বীকার করেছে যে, জেএসএস'এর যুক্তিটাই সঠিক - সেখানে তারা জেএসএস'এর কণ্ঠরোধ করার জন্যই এই দাবী উত্থাপন করেছে। তাদের এই মনোভাব আরো স্পষ্ট হলো নির্বাচনের পর ব্যাপক চাঁদাবাজি, অপহরণ, গুম ও হত্যাযজ্ঞ চালাবার মধ্য দিয়ে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মহালছড়ির খুলারাম পাড়ার বাপ্পী খীসাকে জেএসএস-এ যোগ দেয়ার অপরাধে পণবন্দী করে ৫ লক্ষ টাকা দাবী করেছে। অথচ ঐ বাপ্পী খীসা প্রসিতের সবচাইতে নিকট আত্মীয়।

নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কল্পরঞ্জন চাকমা দাবী করতেন তিনি মাইনী এলাকার সোনার সন্তান, কৃতি সন্তান এবং শান্তিচুক্তির রূপকার। আর তার ছেলে ধীমানবাবু দাবী করতেন শুধু তাদের আত্মীয়রা ভোট দিলেও ১০ হাজার ভোট হয়ে যাবে। কিন্তু ফলাফলে দেখা যে, তিনি জুম্ম ভোট একশতও পায়নি। সেই সোনার ছেলেটি জেএসএস'এর স্থানীয় নেতাদের ধরে এত কাকুতি-মিনতি করেছেন যে শুধু পায়ে ধরাটাই বাকী ছিলো। অথচ তার দর্প ছিল - জেএসএস বিরোধীতা সত্বেও তিনি দু' দু'বার জিতে এসেছেন। অবশেষে মহাআক্ষেপে স্বীকার করলেন যে, প্রসিত বিকাশ খীসা বিশ্বাসঘাতকতা করে সর্বনাশ করলো। হয়তো তার বক্তব্যে সত্যতাও থাকতে পারে। কারণ যে প্রসিতের জন্ম বেঈমানী থেকে (জেএসএস থেকে) সেই প্রসিতের চরিত্র বহুদিনের লালিত স্বপ্ন শুধু একটা নির্বাচনে সবই উলট পালট করে দিয়ে খাগড়াছড়িতে নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

◆

ছোট গল্প

নিয়তি

প্রণয় খীসা ঝিমিত

সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পর প্রদীপ্তর মন মোটেও ভাল লাগছিল না। মন কেবলই উদাস। তাছাড়াও অফিসের কর্তা আজ বেশ রাগান্বিত। কোম্পানীর যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা বলার মত নয়। ট্রাক ভরা মাছ রাস্তার চার ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ্ত বুঝতে পারে না ট্রাক দুর্ঘটনার সাথে তাদের কি সম্পর্ক? তাদের অপরাধ বা কোথায়?

আসলে সবকিছু নিয়তি। বন্ধু বান্ধবীরা এখন জীবন সাজানোর নাটকে ব্যস্ত, অথচ প্রদীপ্ত এখন একটা কোম্পানীর কেরানী। আসলে মানুষ যদি সবকিছু ইচ্ছামাফিক নিজের করে পেত, তাহলে কতই না সুখের হত। কোন কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রনা থাকত না। মনে হত পৃথিবী নামক গ্রহে বাস করেও যেন কল্পনার সেই তুষিত স্বর্গে বসবাস। সবকিছু রূপকথার গল্পের মত হয়ে যেত।

এমন এক জায়গায় চাকরী করছে যেখানে কর্তার মন মেজাজের উপর ভরসা করেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। শুধুমাত্র এ কারণেই প্রদীপ্ত বন্ধু বান্ধবীদের সাথে আড্ডায় কম মিশে। কেননা সবাই কম আর বেশী ভাল অবস্থানে অবস্থান করছে।

এসব ভাবনার মাঝে সেই পুরোনো স্মৃতি গ্রাস করলো প্রদীপ্তকে। যেই স্মৃতি প্রদীপ্তের পুরো জীবন ভর করে আজো চিরকুমারের মত অবিবাহিত জীবন যাপন করছে। ১৯৮২ সাল। সবেমাত্র ম্যাট্রিক পাশ করা ছাত্র, ফাষ্ট ডিভিশন পেয়ে পাশ করেছে। গ্রামের সবাই ভাল ছাত্র হিসেবে চিনে। সবার বিশ্বাস কেউ না পারুক অন্ততঃ প্রদীপ্ত ভালো কিছু করতে পারবে। গ্রামের সুনাম অক্ষুন্ন রাখবে।

প্রদীপ্তও স্বপ্ন দেখতো ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ওকালতি শিখে সমাজে নিপীড়িত শোষিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। সেই বছরই বাবা মারা যাওয়ায় কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব হলো না। পরিবারের বড় ছেলে অনেক দায়িত্ব কর্তব্য এসে ভর করলো প্রদীপ্তের কাঁধের উপর। তবুও শেষ ভরসা ছোট ভাই বোনেরা অন্ততঃ কিছু ভালো করুক। ছোট ভাই বোনেরাও তেমন ভালো কিছু করতে পারলো না।

গ্রামের সবাই প্রদীপ্তের মেধাকে আপসোস করলো। অথচ কেউ এগিয়ে আসলো না। এটাই সম্ভবতঃ সমাজের রেওয়াজ।

সেই সময়ের প্রতিদিনের প্রেরণার উৎস কুয়াশা নামের চঞ্চল প্রকৃতির মেয়েটি। যার হাসিতে ওর গজ দাঁতটি মুক্তার মত করে জ্বলতো। যে কিনা নিজের জীবনের চাইতে প্রদীপ্তকে বেশী ভালোবাসতো বলে দাবী করতো। সব সময়ই উৎসাহ যোগাতো যে সমাজে ভালো কিছু করতে গেলে অনেক সময় সমালোচনাকে মুখ বুজে সহ্য করে এগিয়ে যেতে হয়। ধৈর্য হচ্ছে সফলতার মূল চাবিকাঠি। পৃথিবীতে হাঁটতে গিয়ে শুধু সবুজ ঘাস পাবে এমন কোন কথা নেই, পাথরের টুকরো, কাঁচের কচিও পড়ে সেগুলো অবহেলায় এগিয়ে যেতে হয়।

এমনি করে দিনের পর দিন অতিবাহিত হওয়ার পথে পার্বত্য চট্টগ্রামে চারদিকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম জোরালো হয়ে উঠলো। সব পিছু টান ছিঁড়ে ফেলে সেই সংগ্রামে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আজ এই অবস্থানে অবস্থান করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্নভাবে ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে, অশান্ত পরিবেশ শান্ত করার প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়ে গেল। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ মানুষ কিছু দিন চুপচাপ থাকলো। সবাই ভাবলো এবার বুঝি কিছুটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাবে।

এখানেও জুম্ম জনগণের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলো না। নিজের বিছানায় অতীতের এসব কাহিনী ভাবতে ভাবতে কখন সন্ধ্যা ৭টা বেজে গিয়েছে প্রদীপ্ত খেয়ালই করেনি। যখন স্বপ্নের কণ্ঠে শুনতে পেল - আংকেল, তোমার কি অসুখ করেছে? তখনই সবকিছু উপলব্ধি করতে পারলো এবং তখনই প্রদীপ্ত বললো - না তো।

তাহলে অসময়ে অবেলায় শুয়ে আছেন কেন?

- এমনি।

স্বপ্ন হচ্ছে পিতৃহীন অথচ খুব আদরের চার বছরের শিশু। তা-র মা প্রতিচ্ছবি কখনো পিতার অভাব বুঝতে দেননি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হওয়ার পরে অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে প্রদীপ্তের কপালে এই কেরানীগিরি চাকরীটি জুটেছিল তখন থেকেই স্বপ্নদের বাড়ীর একজন স্থায়ী সদস্যের মত করে প্রদীপ্ত সেখানে থাকে। তাছাড়াও স্বপ্নের বাবা কিংশুক অতি ভদ্র, নম্র এবং বিনয়ী ছিলেন। তখনকার সময়ে প্রদীপ্তের কাছের এবং ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল একজনই সে হচ্ছে কিংশুক। দীর্ঘ ১২/১৪ বছরের সংগ্রামে জঙ্গলের ভেতর হাঁটা, চলার নিসঙ্গ জীবনে বিভিন্ন মুহূর্তে প্রদীপ্তকে হাসি-ঠাট্টায় মাতিয়ে রাখতো সে। উনার উর্ধ্ব এবং নিম্ন সকল স্তরের কর্মীদের সাথে সব সময়ই বোঝাপারা থাকতো। কেউ কখনো খারাপ বলতে পারতো না।

চুক্তির পর শুরু হয়ে যায় আরেক রকমের সংগ্রাম। যে সংগ্রাম ১৯৮৩ সনের আত্মঘাতী সংগ্রামকেও হার মানিয়ে যাচ্ছে। তখন আর ঘরে বসে না থেকে আরেক বারের মত কিংশুককে যেতে হলো এমন এক জায়গায়, যে জায়গায় গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনাটুকু কম থাকে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে না গেলে নয়, যা প্রয়োজন জুম্ম জাতীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে।

শেষ বারের মত দেখা হয়ে বলেছিল - প্রদীপ্ত, আমাদের জুম্ম জাতির ভবিষ্যৎ খুব ঘোলাতে হয়ে এসেছে। এ মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন সকলের ঐক্যবদ্ধতার ভিত্তিতে ঐকান্তিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। আগাছার কারণে আমরা অনেক পিছনে পড়ে যা"ছি। আরো এগিয়ে যেতে হবে। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্ততঃ কিছুটা হলেও স্বাধীকারের সাধ বুঝতে পারে। রাত তখন ৮টা বেজে গিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে স্বপ্ন ডাকতে এসে বলল - আংকেল, ভাত খাবেন, চলুন। আর কিছু না বলে প্রদীপ্ত খাবার টেবিলে চলে গেল। সেখানে প্রতিচ্ছবি প্রদীপ্তের জন্য অপো করছে। খাবার খেতে খেতে যথেষ্ট হাসি তামাশার পর এক মুহূর্তে স্বপ্ন বলল -

আংকেল, বাবা কবে আসবে? আমি প্রায়ই বাবাকে স্বপ্নে দেখি। আমাকে অনেক আদর করে।

আচ্ছা, বাবা কেন এত দেরী করছে? আমার প্রতি একটুও টান নেই বুঝি?

এসব প্রশ্নের পর প্রদীপ্ত শুধু বলতে পারলো যে, তোমার বাবা অবশ্যই আসবে।

-সত্যি বলছেন তো আংকেল?

- হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

ছোট্ট শিশু স্বপ্নের কত আশা, বিশ্বাস তার বাবা চলে আসবে। অথচ যে চলে গেছে যাকে জোর করে নিয়ে গেছে তাকে কি কোন মতে ফিরিয়ে আনা যাবে?

তাহলে ছোট্ট শিশু স্বপ্নের স্বপ্ন কি সব অবাস্তব???

◆

১০ নভেম্বর অমর হউক

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ১০ নভেম্বর ২০০১ রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত